দেশপ্রেম

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা



মাসুদ রানা

দেশপ্রেম

কাজী আনোয়ার হোসেন

ধরুন, বাংলাদেশী এক বিজ্ঞানী যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কার করল, আর অমনি সেটা কেড়ে নেয়ার পাঁয়তারা শুরু করে দিল কাছেপিঠের দুটি রাষ্ট্র। আপনি কি সেটা মেনে নেবেন? শুনে আপনার রক্ত যেমন গরম হয়ে উঠবে, মাসুদ রানার রক্তও তেমনি গরম হয়ে উঠল—কারণ ঘটেছে ঠিক তাই। কিন্তু রানা যখন শুনল দু'জন জিম্মিকে দুর্ভেদ্য এক ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত করে আনতে হবে, ভয়ে কলজেটা কেঁপে উঠল ওর। তবে, আপনারা তো জানেনই, পিছু হটার বান্দা সে নয়।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৩০৯

দেশপ্রেম

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী



বত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7309-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-309
DESHPREM
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

বাঘের মত চেহারা, শোনা যায় কেউ নাকি কখনও তাঁকে হাসতে দেখেনি; তিনিই সবার আগে এলেন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির চীফ কর্নেল হেমায়েত হায়দার। বিসিআই ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খানিকটা রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আছে। বিসিআই-এর অন্যতম সেরা এজেন্টের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় কর্নেল যদি একটু বেশি চাপ দিয়ে থাকেন, মেজবান হিসেবে রানার উচিত হবে বুঝতে না পারার ভান করা। রানা করলও তাই, তবে হাসিটা দেখাল অনেকটা কান্নার মত। হাত ছেড়ে দিয়ে রানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন কর্নেল হেমায়েত হায়দার, 'ব্রাভো, মাই সান! আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে গর্বিত।' প্রশংসা করলেন, অথচ ভঙ্গিটা মারমুখো, গর্বিত হতে না পারলেই যেন ভাল হত। রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ইলোরার পিছু নিয়ে চলে গেলেন তিনি মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারের দিকে।

এর পাঁচ মিনিট পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলেন জেনারেল চৌধুরী আশরাফুজ্জামান, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ। বাহুল্যবর্জিত তালগাছ বলা চলে; ঠোঁটের দু'পাশে এমন সব রেখা আর ভাঁজ আছে, দেখে মনে হয় সারাক্ষণ হাসছেন। কিন্তু চোখ দুটো স্থির। একেই বোধহয় পাথুরে চোখ বলে, মণি

নড়লেও টের পাওয়া যায় না। রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন তিনি। 'পথ দেখাও,' বলে চলে গেলেন ইলোরার সঙ্গে। জেনারেলের কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসল রানা। কত রকম অভিমানই না থাকে মানুষের! ট্রেনিং পিরিয়ডে, পরেও, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে রানার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন চৌধুরী আশরাফুজ্জামান। অত্যন্ত স্নেহ করতেন ওকে, ব্যক্তিগত আলাপের সময় প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, 'তোমার মত অফিসাররাই সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, রানা। আমি চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই, একদিন তুমি চীফ অভ আর্মি স্টাফ হয়েছ।' সেই রানা হঠাৎ করে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসায় ব্যক্তিগতভাবে খুব বড় আঘাত পান তিনি। রানার প্রতি তাঁর সেই স্নেহ এখনও নিশ্চয় আছে, অভিমানের বহর দেখেই সেটা আন্দাজ করা যায়। শোনা যায়, একে-ওকে জিজ্ঞেস করে রানার সব খবরই রাখেন তিনি, কিন্তু কথা বলেন না ওর সঙ্গে। যদিও প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনে রানার পাঠানো উপহার আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি কখনও। ইনি আসছেন বলেই কি ওকে আজ অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকতে বলেছেন রাহাত খান? এখানেও রেষারেষি—দুই বুড়োর মধ্যে?

জেনারেলের সঙ্গে আরও দুই ভদ্রলোক এসেছেন। প্রথমজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব শাহিন সাযযাদ, দ্বিতীয়জন বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইলিয়াস আহমেদ।

সবশেষে এলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয়।

কাজ শেষ, নিজের অফিস কামরায় অস্থির পায়ে পায়চারি করছে রানা। অঙ্কটা কোনভাবেই মেলাতে পারছে না। মাঝে মাঝে কটমট করে চাইছে কাজে ব্যস্ত ওর হাসিখুশি, সুন্দরী সেক্রেটারী কাকলির দিকে। ইলোরার সঙ্গে জবর ভাব মেয়েটার, নিশ্চয় জানে ছয়তলার ওই ঘরটায় এত লোকের সমাগম কিসের

জন্যে। কিন্তু মুখ খুলছে না কিছুতেই। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করায় হতাশ ভঙ্গি করে বলেছে, 'দেখো, মাসুদ ভাই, মাথাটা একটু খাটাও। সত্যিই যদি-গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে থাকে সেটা আমার বা ইলোরার চেয়ে তোমারই তো আগে জানার কথা। তুমি তো আমাকে কিছু জানাওনি, আমি জানব কি করে? আমি শুধু শুনেছি গতরাতে বাড়ি যাননি চীফ, সোহেল সাহেবও না।'

'অ্যাঁ? এতবড় একটা খবর, পাজি মেয়ে বেমালুম চেপে রেখেছ পেটের মধ্যে! আগে বলোনি কেন, সোহেলকে ঠেসে ধরে মুখ খুলিয়ে ছাড়তাম।'

ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল রানা। তাই দেখে মৃদু হাসল কাকলি। 'তাঁকে পেলে তো! তিনিও তো স্যারের সঙ্গে।' কফি কর্নারের দিকে ইঙ্গিত করল চোখ দিয়ে, 'তারচেয়ে-একটু সুস্থির হয়ে বসো, আমি কফি করে আনছি। জরুরী ব্যাপার যখন, নিশ্চয়ই ডাকা হবে তোমাকে।'

'কফি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাইন পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই বুড়োর ঘরে বার কয়েক কফি নিয়ে গেছে বুড়িটা?'

'বুড়ি আবার পেলে কোথায়?'

'ওই তোমার বান্ধবী...ইলোরা।'

'পঁচিশ বছর বয়সেই ও বুড়ি হয়ে গেল কি করে?'

'তুমি লক্ষ করোনি? আশ্চর্য! খেয়াল করোনি আমাকে না পেয়ে কেমন বুড়িয়ে মত যাচ্ছে মেয়েটা?'

হা-হা করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল কাকলি।

'আরে, এতে হাসির কি আছে! বিশ্বাস হচ্ছে না? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো কথাটা হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি কি না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না।'

'পাগল!' বলে কফি কর্নারের দিকে এগোল কাকলি। 'কি জিজ্ঞেস করেছিলে ওকে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম সোহেল কোথায় গেছে। বলল, জানে

না।'

'ঠিকই তো বলেছে,' জোরের সঙ্গে বলল কাকলি, 'অফিশিয়াল সিক্রেট আউট করবে কেন?'

'তাহলে তোমাকে বলল কি করে? এতে সিক্রেট আউট হলো না?' মধুর হাসি হাসল রানা। 'মানেটা কি? আমি ওর চোখের মণি, কলজের টুকরো–সেই আমাকেই বলছে না, অথচ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলে ফেলছে সব সিক্রেট!'

'কে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী? আমি?'

'তবে আর কে?' আবার হা-হা করে হেসে উঠল মেয়েটা।

রানাও হাসছে। বলল, 'হাসো। রানার্স-আপ হয়েছ জেনে খুব খুশি লাগছে, না? যাক, কাজের কথায় আসা যাক। তুমি বলছ, সারারাত বসের সঙ্গে মীটিং করেছে সোহেল। কি নিয়ে মীটিং তা নিশ্চয়ই বলেছে ইলোরা ডাইনী?'

দুইহাতে দু'কাপ কফি নিয়ে দ্রুতপায়ে এদিকে আসছিল কাকলি, থমকে দাঁড়াল। হাসি সামলে নিয়ে নিজের টেবিলে নামিয়ে রাখল একটা কাপ, রানার সামনে রাখল অপরটি। তারপর দুইহাত কোমরে রেখে বলল, 'কী অস্থির লোকরে, বাবা! একটু পরেই ডাকবে বস্, তাও তর সইছে না।'

'আসলে কাজটা পাচ্ছি, না ফসকে যাবে, সেটা জানতে ইচ্ছে করে না মানুষের?'

'আমার করে না। তোমাদের কাজ মানেই তো চোখ বন্ধ করে বিপদ আর মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া। এমন কাজ ফসকে গেলেই বরং খুশি হই আমি। তোমার মত গুণ্ডা প্রকৃতির বেপরোয়া লোকের হয়তো জানতে ইচ্ছে করে। এখন বলো দেখি, দুষ্ট বালক, ঠিক কি জানতে চাও?'

'আপামণি, আমি জানতে চাই, কফি নিয়ে গিয়ে ভেতরে কি দেখেছে ইলোরা।'

'তেমন কিছুই না। কখনও দেখেছে গভীর আলাপে মত্ত

দুজন, কখনও টেলিফোনে কথা বলছে বাইরের কারও সঙ্গে, শেষবার দেখেছে দুজন মিলে টিভিতে একটা ফিল্ম দেখছিল।'

'অ্যাঁ?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বলো কি! সোহেলকে নিয়ে ব্লু-ফিল্ম দেখছে বুড়ো?'

'এরমধ্যে আবার ব্লু-ফিল্ম পেলে কোথায়?'

'সারারাত জেগে ছবি দেখলে আর কি ছবি দেখে মানুষ?' বলেই আবার পায়চারি শুরু করল রানা।

'কফির কি হবে?'

'ওহ্-হো!' বলে কাপটা তুলেই বড় করে চুমুক দিল রানা, পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠল। পুড়ে গেছে জিভ।

পানি আনবে না কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না কাকলি, এমনি সময় ইন্টারকমে ভেসে এলো ইলোরার কণ্ঠস্বর।

'রানা?'

মুহূর্তে হাসি ফুটল রানার মুখে। নরম গলায় বলল, 'হ্যাঁ, রানী! এতদিন যা বলবে বলবে করেও বলতে পারছিলে না, সেই কথাটা তো? নাও, বলে ফেলো–শুনছি।'

'মেজর জেনারেল লাইনে আছেন, কথা বলো।'

আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়ল রানার। কামড়ে ধরে আছে। নিঃশব্দে হাসছে কাকলি, এক আঙুল তুলে ভঙ্গি করে বোঝাচ্ছে, ঠিক হয়েছে! কানে রিসিভার ধরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা–জবান বন্ধ।

'রানা?' রাহাত খানের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে রানার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। 'এখুনি আমার চেম্বারে চলে এসো।'

'ইয়েস, স্যার!'

রানাকে কামরায় ঢুকতে দেখে অপমানজনক ভঙ্গিতে মুচকি হাসল ইলোরা। 'কেমন জব্দ? আমার সঙ্গে লাগতে আসবে আর? যাও, সোজা ঢুকে পড়ো, বস্ অপেক্ষা করছেন।'

'এই মুহূর্তে রানা অন্য এক মানুষ, ইলোরার কথা ভাল করে শুনতেই পেল না। মন থেকে উদ্বেগ আর উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। মাথাটাকেও পরিষ্কার আর খালি করে রেখেছে। বস্ নিশ্চয়ই কোন বিপদের কথা শোনাবেন, দেশের জন্যে গুরুতর কোন সমস্যা ব্যাখ্যা করবেন। সেই বিপদ আর সমস্যার গভীরে ঢোকার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই ভেতরে ঢুকছে রানা।

দুই

রাহাত খানের চোখে-মুখে আশ্চর্য এক দৃঢ়তা, ভেতরে ঢুকে এটাই প্রথমে লক্ষ করল রানা। রাত্রি জাগরণের কোন চিহ্নই নেই, শুধু একটু লালচে হয়ে আছে চোখ দুটো–যেন ধিকিধিকি জ্বলছে ছাইচাপা দু'টুকরো অঙ্গার। বসে আছেন রিভলভিং চেয়ারে, শিরদাঁড়া খাড়া। হাতের চুরুট থেকে ধোঁয়া উঠছে। চেম্বারে একা তিনি, কখন কে জানে বেরিয়ে গেছে সোহেল।

'বসো,' বললেন তিনি, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছেন।

হাতলবিহীন একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। খুঁটিয়ে না দেখেও বুঝতে পারছে অতিথিরা চলে যাবার পর কামরা ও ডেস্ক পরিষ্কার করা হয়েছে। এসি কোন শব্দ করছে না, ঠাণ্ডা বাতাস ভারি হয়ে আছে হাভানা চুরুটের কড়া, মিষ্টি গন্ধে।

'চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে বসো,' রানাকে অবাক করে দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'ভিডিও ক্যাসেটে রেকর্ড করা একটা

ডকুমেন্টারি দেখাই তোমাকে।' ডেস্ক থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোল তুললেন তিনি, তাকিয়ে আছেন কামরার এক কোণে, ওদিকে ট্রলির ওপর একটা একুশ ইঞ্চি কালার টিভি ও একটা ভিসিআর রয়েছে।

চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে, বসের দিকে খানিকটা পাশ ফিরে বসল রানা। রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিলেন রাহাত খান। লাল আলো জ্বলতে বোঝা গেল ভিসিআর সচল হয়েছে, তারমানে রেকর্ড করা একটা ক্যাসেট আগেই ঢোকানো হয়েছে ওটায়। পরমুহূর্তে টিভির স্ক্রীন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ছবিটা তোলা হয়েছে আসমানের অনেক ওপর থেকে, স্যাটেলাইটে বসানো ক্যামেরার সাহায্যে।

'এলাকাটা চিনতে পারছ?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'জ্বী, স্যার। প্রশান্ত মহাসাগরের ছবি।'

এরপর জুম লেন্সের সাহায্যে স্যাটেলাইট ক্যামেরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপপুঞ্জের ওপর ফোকাস করল, প্রতিমুহূর্তে দ্বীপগুলোর আকৃতি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। ধীরে ধীরে গাছপালা, লেক, বাড়ি-ঘর, জেটি, রাস্তা–প্রতিটি খুঁটিনাটি আলাদাভাবে চেনা গেল। পালা করে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে ফোকাস হচ্ছে ক্যামেরা। ছবিতে এখন লোকজনও দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা ধরতে রানার বেশি সময় লাগল না। 'স্যার, সবগুলো দ্বীপ থেকেই তো দেখছি মানুষজনকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ,' রাহাত খান বললেন। 'খেয়াল করে দেখো, মাঝখানের দ্বীপটাই সবচেয়ে বড়। ওখানকার লোকজনকে একমাস আগেই সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন কাজ চলছে আশপাশের অন্তত বারোটা দ্বীপ খালি করার।'

'কেন, স্যার?'

'উত্তরটা তুমিই দাও,' বললেন রাহাত খান। 'তোমার

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান কি বলে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে রানা জবাব দিল, 'সাধারণত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতেই আমেরিকা নিউক্লিয়ার টেস্ট করে থাকে...'

'রাইট।' রাহাত খানের ঠোঁটের কোণে সন্তুষ্টির ক্ষীণ রেখা ফুটেই মিলিয়ে গেল। 'হ্যাঁ, এখানে আরও একটা পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছি আমরা।' রিমোট কন্ট্রোলের আরেকটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। টিভির স্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেল, দ্রুতগতি খসখস শব্দ তুলে ভিসিআর ফাস্ট-ফরোয়ার্ড শুরু করেছে। ত্রিশ সেকেন্ড পর আবার 'প্লে' বাটনে চাপ দিলেন। 'এবার ওদের প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্যায়টা দেখো।'

টিভি স্ক্রীনে আবার রঙিন ছবি ফুটল। এবার পালা করে স্যাটেলাইট, হেলিকপ্টার, প্লেন ও সামুদ্রিক জাহাজ থেকে প্রস্তুতি পর্ব রেকর্ড করা হয়েছে। সচল ছবিতে যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা রাজ্যের একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ঘাঁটি দেখা গেল।

'পঞ্চাশ ও আশি মেগাটনের দুটো পারমাণবিক বোমা ফাটানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে,' মৃদু, শান্ত কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'দ্বীপগুলো খালি করার পনেরো দিন পরের ঘটনা এটা। ইতিমধ্যে একজোড়া মিসাইলে ফিট করা হয়েছে বোমা। এখুনি রওনা হবে ওগুলো—ভি-এক্স আর ভি-ওয়াই।'

'কিন্তু, স্যার,' রানা বিস্মিত, 'তা কি করে হয়! নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, ভারত ও পাকিস্তান নিউক্লিয়ার টেস্ট করলেও, সব টেস্টই মাটির তলায় করা হয়। মাটির ওপর, অর্থাৎ সারফেসে টেস্ট করা হলে আকাশে ব্যাঙের ছাতা তৈরি হবে, ধোঁয়ার সঙ্গে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে রেডিয়েশন। এরকম আরও অনেক বিপদের আশঙ্কা থাকায়

সারফেসে নিউক্লিয়ার টেস্ট কেউই এখন আর করে না...'

'স্টার ওঅর সম্পর্কে জানো তো?' রানাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'আমেরিকা এই প্রজেক্ট শুরু করেছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়, যখন সুপারপাওয়ার হিসেবে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। রুশরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়ায় আমেরিকা স্টার ওঅর কর্মসূচি বাতিল করে ঠিকই, কিন্তু তার আগেই গোপনে তারা নিজেদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের উন্নতি যা করার করে নিয়েছে। টিভির স্ক্রীনে যে মিসাইল তুমি দেখছ, ওগুলোর ক্ষমতা এক কথায় অবিশ্বাস্য। প্রথমে রেঞ্জের কথাই ধরো। আকাশের দিকে তাক করে ছোঁড়া হলে ওদের এই মিসাইল পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার ত্যাগ করে মহাশূন্যে চলে যেতে পারবে, এমনকি সেই একেবারে চাঁদ পর্যন্ত। এগুলো আসলে রকেটের খুদে সংস্করণ। তারপর ধরো, পেনিট্রেট করার ক্ষমতা। এই মিসাইল বিস্ফোরিত হবার আগে মাটির পাঁচশো গজ নিচে পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে। পাঁচ গজ গভীরে বিস্ফোরিত হবে নাকি পাঁচশো গজ গভীরে, সেটা টাইম মেকানিজম সেট করার ওপর নির্ভর করে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে আমেরিকানদের এই সর্বশেষ নিউক্লিয়ার টেস্ট সারফেসে নয়, আন্ডারগ্রাউন্ডেই ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'জ্বী, স্যার,' বিড় বিড় করল রানা।

'ওই রওনা হলো মিসাইল!'

মিসাইলের উৎক্ষেপণ ও যাত্রাপথ, পালা করে স্যাটেলাইট ও প্লেন থেকে ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে। আরিজোনা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওই দ্বীপপুঞ্জ মাত্র কয়েকশো মাইল দূরে, মিসাইল দুটোর পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র দেড় থেকে দু'মিনিট। টিভি স্ক্রীনে একটা বক্স দেখা গেল, বক্সের ভেতর ফুটে উঠল দ্বীপপুঞ্জের ছবি। মিসাইল দুটো প্রশান্ত মহাসাগরে চলে আসার পর, বক্সটা প্রসারিত হয়ে টিভির পুরো স্ক্রীন দখল করে নিল।

স্ক্রীনে এখন মিসাইল ও দ্বীপপুঞ্জ একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। মিসাইল দুটোর মাঝখানে দূরত্ব হাজার গজের বেশি নয়।

'পাশাপাশি একজোড়া দ্বীপকে টার্গেট করে ওগুলো ছোঁড়া হয়েছে,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন রাহাত খান। 'একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হবে বোমা দুটো।'

কিন্তু হঠাৎ রানা দেখল মিসাইল দুটো পাগলামি শুরু করেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, দুটো মিসাইল দু'দিকে রওনা হলো। ভি-এক্স একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে পুবমুখো হলো, ফিরে যাচ্ছে আমেরিকার দিকে। ভি-ওয়াই ঘুরে গেল পশ্চিমে।

'স্যার!'

'ইয়েস?' রাহাত খান যেন রানার প্রশ্ন শোনার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

'ওগুলোকে কি গ্রাউন্ড থেকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'না।'

'তাহলে আমরা কি ঘটতে দেখছি?' রানা হতভম্ব।

'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে একমত–দেয়ার ইজ সামথিং রঙ। তবে দেখতে থাকো, আরও অনেক মজা আছে।'

মজা! রানার বিস্ময় সীমাহীন। নিউক্লিয়ার ওঅরহেড নিয়ে দুটো মিসাইল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, অথচ বস্ ব্যাপারটাকে মজা বলছেন!

ভি-এক্স যুক্তরাষ্ট্রকে পেরিয়ে এসে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিচ্ছে। নিক্ষিপ্ত হবার ছ'মিনিটের মাথায় আফ্রিকায়, লিবিয়ার ওপর চলে এল ওটা। ওদিকে ছবির ভেতর আরেক ছবিতে দেখা যাচ্ছে উল্টোদিকে রওনা হয়ে অস্ট্রেলিয়ার গা ঘেঁষে চীনের দিকে ছুটছে ভি-ওয়াই।

দিক বদলে ভি-এক্স এবার রওনা হলো রাশিয়ার দিকে। ইউক্রেন পার হয়ে সেটা রাশিয়ার আকাশ সীমায় ঢুকে পড়ল,

তারপর চলে এল মস্কোর মাটি থেকে বিশ মাইল ওপরে। গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে নামতে যাচ্ছে দেখে আঁতকে উঠল রানা। জানা কথা এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না।

ওর ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। মস্কো থেকে আকাশে উঠল এক ঝাঁক ইন্টারসেপটর মিসাইল এবং নিঃসঙ্গ একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, ওঅরহেড সহ।

ইন্টারসেপটরগুলোকে অনায়াসে ফাঁকি দিল ভি-এক্স, তবে ফাঁকি দেয়ার ধরনটা বড় বিচিত্র। প্রতিটি রুশ মিসাইলকে কাছে আসতে দিল ভি-এক্স, তারপর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠার আগের মুহূর্তে ঝট করে দিক বদলে আরেকদিকে সরে গেল। দু'একটাকে ধাওয়া করার সুযোগ করে দিল গতি কমিয়ে, কিন্তু ধরে ফেলার ঠিক আগে স্পীড বাড়িয়ে চলে গেল নাগালের বাইরে—দেখে মনে হলো ভি-এক্সের নিজস্ব প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি না থেকেই পারে না।

টার্গেট মিস করে ইন্টারসেপটর মিসাইলগুলো এক সময় গতি হারিয়ে ফেলল, বেকায়দা একটা ভঙ্গিতে খসে পড়তে শুরু করল নিচের দিকে। ভি-এক্স এখন নির্বিঘ্নে মস্কোর ওপর আঘাত হানতে পারে, পঞ্চাশ মেগাটন নিউক্লিয়ার ওঅরহেড শহরের প্রতিটি প্রাণীর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। আবার দিক বদলে ভি-এক্স রওনা হলো উত্তর মহাসাগরের দিকে, সরাসরি গোত্তা খেয়ে পড়ল সাগরের পানিতে। পানিতে পড়ার পরও অনেকক্ষণ স্থির থাকল ক্যামেরা, কিন্তু পানির তলায় কোন বিস্ফোরণ ঘটল না।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা গেল চীনের আকাশেও। ভি-ওয়াইকে বাধা দিতে আকাশে উঠল এক ঝাঁক চীনা ইন্টারসেপটর মিসাইল। একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলও ছাড়ল চীনারা। ইন্টারসেপ্টরগুলো কোন কাজে আসল না, ওগুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলল ভি-ওয়াই, তারপর চীনের মাটিতে না পড়ে দিক বদলে ভারত মহাসাগরে এসে গোত্তা

খেলো। পানিতে পড়ার পর ভি-ওয়াইও বিস্ফোরিত হয়নি।

রুশ আর চীনাদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ সীমায়, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ। মার্কিন ইন্টারসেপটর মিসাইলগুলো ঘাঁটি থেকে আকাশে উঠলেও, লক্ষ্যভেদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। তবে কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও রুশ ও চীনা মিসাইল ওয়াশিংটনে পড়ল না, দিক বদলে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর চলে এল দুটোই, তারপর পানিতে পড়ে ডুবে গেল।

দু'হাতে চোখ রগড়াল রানা, আটকে রাখা দম ছেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'কেউ বিশ্বাস করবে না বাস্তবে এরকম কিছু ঘটেছে। কমপিউটর গেমস, স্যার?' বসের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রানা।

'নো গেমস, কমপিউটরাইজড্ অর আদারওয়াইজ,' শান্ত, প্রায় কৌতুকের সুরে বললেন রাহাত খান। 'এতক্ষণ তুমি যা দেখলে তার প্রতিটি সিকোয়েন্স বাস্তব।'

'ইয়া আল্লাহ্!' ফিসফিস করল রানা।

'তবে মাত্র অর্ধেকটা দেখেছ তুমি, রানা,' বললেন বস্। 'বাকি অর্ধেকটা দেখার পর শুনব তোমার কি প্রতিক্রিয়া।'

ইতিমধ্যে দু'বার নিজেকে চিমটি কাটা হয়ে গেছে, তৃতীয় বার নিজেকে ব্যথা দিয়ে অস্ফুটে উফ্ করে উঠল রানা।

'নিজেকে পীড়ন করার কোন দরকার নেই,' ব্যাপারটা টের পেয়ে পরামর্শ দিলেন বস্। 'আমি বলছি, তুমি স্বপ্ন দেখছ না।'

একদম বোকা বনে গেছে রানা। 'কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব, স্যার!'

'কিভাবে সম্ভব বুঝতে হলে এই ক্যাসেটটা ভিসিআর-এ ভরতে হবে,' বললেন রাহাত খান, দেরাজ থেকে একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। 'প্রথম ক্যাসেটটা বের করে আনো।'

রানা যেন যন্ত্রমানব, একটা রোবট, চেয়ার ছেড়ে আড়ষ্টভঙ্গিতে টিভি ও ভিসিআর-এর দিকে এগোল। প্রথম ক্যাসেটটা বের করল ও, দ্বিতীয় ক্যাসেট ঢোকাল, তারপর ফিরে এসে আবার বসল চেয়ারে। ইতিমধ্যে ভিসিআর অন করেছেন রাহাত খান।

'যন্ত্রটা ভাল করে লক্ষ করো,' বললেন তিনি।

টিভি স্ক্রীনে বড়সড় একটা কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে পাচ্ছে রানা, অনেকটা বোয়িং প্লেনে যেমন থাকে, তবে আকারে এটা আরও বড় এবং জটিল বলে মনে হলো। প্যানেলটার সামনের অংশে রয়েছে বিশাল এক আলোকিত স্ক্রীন, স্ক্রীনের গায়ে ফুটে আছে গোটা পৃথিবীর মানচিত্র। মানচিত্রটা বহুরঙা।

স্ক্রীনটার নিচে ও দু'পাশের প্যানেলে শত শত সুইচ, ডায়াল, মিটার, লিভার ও হুইল দেখা যাচ্ছে। প্যানেলটার সামনে সুট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে থাকায় মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

স্ক্রীনের মানচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা থেকে, দুটো রক্তবর্ণ ফোঁটা এক যোগে ওপরে উঠতে শুরু করল। তারপর ওগুলো রওনা হলো প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। প্যানেলের সামনে দাঁড়ানো লোকটার দুই হাত নড়ে উঠতে দেখল রানা, সেই সঙ্গে একটা ফোঁটা দিক বদলে রওনা হলো পুবদিকে, আরেকটা পশ্চিম দিকে। পুবমুখো ফোঁটাটা যুক্তরাষ্ট্র পেরিয়ে আফ্রিকায়, লিবিয়ার ওপর চলে এল। উল্টোদিকে, রওনা হয়ে দ্বিতীয় ফোঁটা অস্ট্রেলিয়ার আকাশসীমা ঘেঁষে চীনের দিকে ছুটছে। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়ানো লোকটার হাত দুটো সারাক্ষণ ব্যস্ত দেখল রানা। সন্দেহ নেই সুইচ, ডায়াল, লিভার ইত্যাদি অপারেট করে ফোঁটা দুটোকে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে। এক সময় দেখা গেল রাশিয়া ও চীন থেকেও দুটো ফোঁটা উঠল আকাশে, ওগুলোও যেন লোকটার হাতের পুতুল।

জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে রাহাত খান বললেন, 'এর আগের

ক্যাসেটে আমরা যা দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি, তাই না? প্রথম ফোঁটা দুটো আসলে মার্কিনীদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ভি-এক্স আর ভি-ওয়াই।'

'তারমানে গ্রাউন্ড থেকে, ওই কন্ট্রোল প্যানেলের সাহায্যে, আমেরিকান মিসাইল দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'কিন্তু, স্যার, এরকম যন্ত্রের কথা আগে তো কখনও শুনিনি। তাছাড়া আমেরিকানরা চীন বা রাশিয়ার মিসাইল কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে?'

'তুমি ধরেই নিচ্ছ যন্ত্রটা আমেরিকানদের,' রাহাত খান বললেন। 'তা কিন্তু সত্যি নয়।'

'আমেরিকানদের নয়!' রানাকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়েছে।

'না। ওটা আমাদের।'

'আমাদের!' ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, পায়ের ধাক্কায় চেয়ারটা উল্টে পড়ল কার্পেটে। 'স্যার!' আর কিছু বলতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে বসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কথাটা আর কারও মুখে শুনলে নির্ঘাত তাকে পাগল ভাবত ও। আবার সন্দেহ হলো, স্বপ্ন দেখছে? নাকি বস্ পাগল হয়ে গেছেন?

'চেয়ারটা তুলে শান্ত হয়ে বসো।' রাহাত খান গম্ভীর। ইতিমধ্যে সুইচ টিপে ভিসিআর বন্ধ করে দিয়েছেন।

চেয়ারটা তুলে আবার বসল রানা, বস্ কি বলেন শোনার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

'নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট প্রফেসর মইনুল হাসানের নাম শুনেছ?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জ্বী-না।'

কথা বলার ফাঁকে খোলা একটা ফোল্ডারে চোখ বুলাচ্ছেন রাহাত খান। 'বছর তিনেক আগে প্রফেসর মইনুল হাসান যুক্তরাষ্ট্রের নাসায় একটা গবেষণার কাজ পান। ওই সময় দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল তাঁর। ভদ্রলোকের গবেষণার বিষয় ছিল লেইযার-

গাইডেড মিসাইল। অপটিক্যাল মেইজার বা লেইযার ডিভাইস ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা লাইট বীম এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আবিষ্কার করেন তিনি। তাঁর আবিষ্কারের পুরো ফলাফল তিনি প্রকাশ করেননি, তবে যতটুকু প্রকাশ করেন তা থেকে নাসা তাদের মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেম অনেক উন্নত করে তোলার সুযোগ পায়। তখনই বিজ্ঞানী মহলে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। সবাই টের পেয়ে যায়—প্রফেসর হাসানের আবিষ্কারের মধ্যে অসাধ্য সাধন করার উপাদান আছে।

'নাসার সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তি ছিল এক বছরের। মেয়াদ শেষ হবার ঠিক আগে আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। জানিয়েছিলাম, ইচ্ছে করলে তিনি দেশে ফিরে এসে পছন্দমত যে-কোনও সাবজেক্টে গবেষণা করতে পারেন, আমরা আমাদের সাধ্যমত সব রকম আধুনিক ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা করে দেব। বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, তাঁর ইচ্ছেমতই সব কিছু নির্ধারণ করা হবে। একবিন্দু দ্বিধা না করে প্রস্তাবটা সানন্দে গ্রহণ করেন প্রফেসর হাসান, আজ থেকে আঠারো মাস আগে সপরিবারে চলে আসেন ঢাকায়। নিজের বেতন ধার্য করেছেন আমেরিকায় যা পেতেন তার হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। তাঁর যুক্তি, এদেশে খরচ কম।

'আমাদের আণবিক শক্তি কমিশন ঢাকায় তাদের কমপাউন্ডে একটা বিশেষ গবেষণা সেল তৈরি করে, সেই সেলের প্রধান গবেষক করা হয় প্রফেসর হাসানকে। এখানে প্রায় এক বছর গবেষণা করার পর ওই যন্ত্রটা তৈরি করেন তিনি।'

'তারমানে ক্যাসেটে যে যন্ত্রটা দেখলাম সেটা ঢাকায়? ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হলো মিসাইলগুলোকে, তারপর ফেলে দেয়া হলো সাগরে?' রানার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'হ্যাঁ।'

'যদি বলি অসম্ভব, তাহলেও কম বলা হয়, স্যার! সত্যি যদি

বাংলাদেশ এরকম কিছু আবিষ্কার করে থাকে, তাহলে তো আমরা সুপারপাওয়ার হয়ে গেছি! কয়েক হাজার মাইল দূরের মিসাইল ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে, যে-কোন প্লেন, যে-কোন যুদ্ধজাহাজ, রকেট ইত্যাদি সবই...'

একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'সুপারপাওয়ার হতে আমাদের অনেক দেরি আছে, রানা। ক্যাসেটের সব ঘটনা তুমি খুঁটিয়ে দেখোনি। যন্ত্রটা শুধু নিউক্লিয়ার ওঅরহেডসহ চারটে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল নিয়ন্ত্রণ করেছে, ইন্টারসেপটর মিসাইলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। এ থেকে কি বোঝা যায়?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'ও, আচ্ছা! তারমানে যে মিসাইলে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড থাকবে, যন্ত্রটা শুধু সেটাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু তাই বা কম কি, স্যার! দুনিয়াকে আমরা আণবিক যুদ্ধের হুমকি থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি দিতে পারব যদি...'

'হ্যাঁ, যন্ত্রটা আবিষ্কারের পর প্রফেসর হাসান এবং বাংলাদেশ সরকার একমত হয়, দুনিয়ার বুকে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যবহার করা হবে ওটা। সিদ্ধান্ত হয়, এই যন্ত্র অনেকগুলো বানানো হবে, এবং ছোটবড় সব দেশকেই একটা করে দেয়া হবে। তবে মূল যন্ত্র এবং পরবর্তী সংস্করণের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকবে। কোন দেশের কোথায় ক'টা আণবিক বোমা আছে, এটা শুধু মূল যন্ত্রে ধরা পড়বে—ওগুলো অ্যাকটিভেট করা হোক বা স্থানান্তরিত করা হোক, তাও সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে। আর বিলি করা যন্ত্রে ধরা পড়বে শুধু সংশ্লিষ্ট দেশে আঘাত হানতে রওনা হওয়া ওঅরহেডসহ মিসাইল, হেলিকপ্টার, প্লেন বা রকেট। শুধু ধরা পড়বে না, ওই যন্ত্রের সাহায্যে দেশটি ওগুলোকে, এমন কি ওদের বাহনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। মূলযন্ত্র আমরা কাউকে দেব না, ওটা বাংলাদেশে থাকবে।'

'সবাই একসময় উপলব্ধি করবে, আণবিক বোমা বানিয়ে আর কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'কারণ ব্যবহার করাই তো সম্ভব হবে না।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। 'যন্ত্রটা বানাতে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, রানা। এত বেশি যে, আমাদের ফরেন কারেন্সির রিজার্ভ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সরকার তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নতুন যন্ত্র বানিয়ে বিভিন্ন দেশের কাছে কেনার জন্য প্রস্তাব দেবে। ধনী দেশগুলোর জন্য প্রতিটি যন্ত্রের দাম ধরা হবে পাঁচ হাজার কোটি ডলার। মাঝারি দেশ পাবে তিন হাজার কোটি ডলারে, আর গরীব দেশ পাবে মাত্র একশো কোটি ডলারে। আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয়, লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ পাবেন প্রফেসর মইনুল হাসান, বাকিটা জমা হবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। এরপরই আমরা যন্ত্রটার আন্তর্জাতিক পেটেন্ট পাওয়ার জন্যে আবেদন করি। তখনই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। তবে এক আমেরিকা ছাড়া প্রথমে আর কেউ বিশ্বাসই করেনি যে এরকম একটা যন্ত্র আমরা আবিষ্কার করতে পারি।'

'আমেরিকা বিশ্বাস করল, কারণ ওরা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট প্রফেসর হাসান সম্পর্কে জানে,' বলল রানা। 'নাসায় তিনি ওদের হয়ে গবেষণা করেছিলেন।'

'সেটাই আসল কারণ,' বললেন রাহাত খান। 'অ্যাটম বোমা সহ ভি-এক্স ও ভি-ওয়াই সাগরে ডুবে যাওয়ায়, এবং অলৌকিক ভাবে দু-দুটো পারমাণবিক বোমার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়ায় ওরা প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেয় কাজটা আর কারও নয়—প্রফেসর হাসানের। ওদের ওই দুই মিসাইলের উৎক্ষেপণ ও যাত্রাপথ ক্যামেরায় বন্দী করা ছিল, তারই একটা ক্যাসেট আমাদেরকে পাঠায় ওরা, সেই সঙ্গে অভিযোগ তুলে বলে—যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে বাংলাদেশই দায়ী।'

'তারপর?'

'আরও একশোটা দেশ সহ ওদেরকেও আমরা যন্ত্রের পরবর্তী সংস্করণ কেনার প্রস্তাব দিলাম। যন্ত্রটা সত্যি কাজ করে, এটা দেখানোর জন্যে ডিসপ্লের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি দেশ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। প্রত্যেকের কাছে পঞ্চাশ কোটি ডলার অগ্রিম চাই আমরা। সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা হাতে এলে নতুন যন্ত্রগুলো তৈরির কাজে হাত দিতে পারতেন প্রফেসর হাসান।'

'দেশগুলো কি অগ্রিম দিতে রাজি হয়নি?' রানার গলায় উদ্বেগ।

'না-না, টাকা দিতে সবাই রাজি,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই টাকা আমরা নিতে পারিনি।'

'নিতে পারিনি! কেন?'

'কারণ, মাস তিনেক আগে, কে বা কারা যেন মূল যন্ত্রটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে।'

'সর্বনাশ!' বিষম খাবার অবস্থা হলো রানার। 'কে করল এই স্যাবটাজ?'

রাহাত খান বিষণ্ন, মাথা নাড়লেন। 'তা জানা যায়নি।'

'এখন তাহলে উপায়, স্যার?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল রানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বিসিআই চীফ। 'সমস্যা কি জানো, যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে তা কাউকে জানাবেন না বলে প্রফেসর হাসান তাঁর থিওরি ও ফর্মুলা কোথাও লিখে রাখেননি।'

'তারমানে কি যন্ত্রটা নতুন করে বানানো সম্ভব নয়?'

'সম্ভব, কিন্তু তাতে সময় লেগে যাবে অনেক বেশি।'

'কত বেশি, স্যার?' হাঁফ ছেড়ে জানতে চাইল রানা।

'আরও ধরো বছরখানেক। কিন্তু সময়টা এখন সমস্যা নয়। সমস্যা অন্যখানে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন রাহাত খান, হাত দুটো পিছনে বেঁধে বন্ধ জানালার কাঁচের সামনে গিয়ে দূরে তাকালেন। 'নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টদের একটা আন্তর্জাতিক

সেমিনার ছিল ভারতের সিমলায়, তাতে প্রফেসর হাসানও যোগ দেন,' ধীরে ধীরে আবার বললেন তিনি। 'গতকাল সেমিনার শেষ হবার পর কাউকে কিছু না বলে জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি শহরে চলে গেছেন তিনি। তুমি তো জানই, রিয়াসি ভারতীয় কাশ্মীরের ছোট্ট একটা শহর, পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে। সেখান থেকে টেলিফোনে ইন্ডিয়ান নিউজ্ এজেন্সিকে প্রফেসর হাসান বলেছেন, তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন।'

'মাই গড!' ঘরে বোমা পড়লেও রানা বোধহয় এরকম চমকে উঠত না।

'হ্যাঁ, আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে,' বললেন রাহাত খান, ফিরে এসে আবার নিজের চেয়ারে বসলেন।

রানা পরিষ্কার দেখতে পেল, বসের কপালের পাশে একটা শিরা তিরতির করে লাফাচ্ছে। 'কিন্তু কারণটা কি?' জিজ্ঞেস করল ও। 'ভদ্রলোক এরকম একটা কাজ কেন করতে গেলেন?'

'দ্যাট্স্ দা বিগ কোশ্চেন,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু কেউ আমরা এই প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁর ফাইলে লাল কালির একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই। অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন। তাঁর দেশপ্রেমও পরীক্ষিত।' মাথা নাড়লেন। 'ব্যাপারটা আমি কোনভাবেই মেলাতে পারছি না, রানা।'

'এরকম একটা ব্যাপার হঠাৎ করে ঘটে না,' বলল রানা। 'প্রফেসর হাসান নিশ্চয়ই অনেক দিন থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখছিলেন। এ-ব্যাপারে ওদের বক্তব্য আমরা কি জানতে পেরেছি?'

'ইন্ডিয়ান নিউজ এজেন্সি প্রফেসর হাসানের টেলিফোন পেয়ে একটা চালাকি করে,' বললেন রাহাত খান। 'মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা না করে প্রথমে ওরা ভারত সরকারকে খবরটা জানায়, ফলে একদিন দেরি করে আগামী কাল ওটা দৈনিক পত্রিকায়

বেরুবে। আমরা অবশ্য আমাদের নিজস্ব সূত্র থেকে খবরটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাই। আমাদের হাই কমিশনারকে নির্দেশ দেয়া হয়, তিনি কাল রাতেই ওদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দাবি করেন। ঢাকা থেকে আমাদের পররাষ্ট্র সচিবও ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবকে টেলিফোন করে বাংলাদেশ সরকারের উদ্বেগ ও অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। আমি নিজে কথা বলেছি ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স চীফের সঙ্গে।'

'কি বলছে ওরা?'

'প্রথমে কোন গুরুত্বই দিতে চায়নি, হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। মিথ্যে গুজব, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, একটা মহল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্যাবটাজ করার ষড়যন্ত্র করছে—এইসব বলছিল। আমরা তখন জানালাম, প্রফেসর হাসানের টেলিফোন কলটা রেকর্ড করা হয়েছে, ডুপ্লিকেট একটা ক্যাসেট দিল্লীতে আমাদের হাই কমিশনে পৌঁছেও গেছে। শুনে সুর পাল্টাল ওরা, দুঃখ প্রকাশ করে বলল, খবরটা এখনও তারা পায়নি। এটাও নির্জলা মিথ্যে। আমরা জানতে পেরেছি, প্রফেসর হাসান ফোন করার আধঘণ্টার মধ্যে লেডি সুরাইয়া'স ইন ঘিরে ফেলেছে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লোকজন। লেডি সুরাইয়া'স ইন থ্রী স্টার হোটেল, প্রফেসর হাসান ওখানেই উঠেছেন।'

'এর মানে কি, স্যার?' রানা বিস্মিত। 'এরকম মিথ্যেকথা বলার কারণ কি?'

'কূটনীতিতে এ-সব চলে,' বললেন রাহাত খান। 'মিথ্যে বললে বলুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। ভারত এখনও দাবি করছে, এ-ব্যাপারে তারা কিছুই জানত না, এমনকি আশ্রয় প্রার্থনার আবেদনপত্রটিও এখন পর্যন্ত তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। আজ খানিক আগে শেষ খবর পেয়েছি—তদন্ত করে দেখে পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে একটা ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে সময় চেয়েছে ওরা।' একটু থেমে চশমাটা খুললেন,

টিশ্যু দিয়ে লেন্স পরিষ্কার করে আবার পরলেন চোখে। 'আমাদের মাথাব্যথার বিষয় হলো, রানা, প্রফেসর হাসানকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে কি ঘটবে। কোন সন্দেহ নেই যে তাঁকে পেলে আনন্দে পাগল হয়ে যাবে ওরা। যন্ত্রটা যদি ভারতে বানানো হয়, ওটা আর কোন দেশ পাবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে ভারত হয়ে উঠবে পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ার।

'ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। আমরা আশা করব, আমাদের কোন আবিষ্কার বা সম্পদ ওরা কৌশলে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না। তা যদি করে, স্বভাবতই আমরা তা প্রতিহত করব।

'সিমলা থেকে প্রফেসর হাসানের হঠাৎ করে কাশ্মীরে চলে যাওয়াটাও আমি ভাল চোখে দেখছি না। বিশেষ করে রিয়াসি, আখনুর, নওয়ানশাহর একেবারে সীমান্তের কাছে, ওখানে পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স আইএসআই অত্যন্ত তৎপর। তাছাড়া, জানোই তো, গোটা কাশ্মীর আর জম্মুকে মুসলিম গেরিলারা স্রেফ উনুন বানিয়ে রেখেছে। এত থাকতে হুট করে ওখানেই বা কেন গেলেন ভদ্রলোক কে জানে! আইএনএ-কে উনি বলেছেন বটে রিয়াসির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শুনে বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু…সে যাক। অন্তত এই কেসে আমরা ভারত ও পাকিস্তান, কাউকেই বিশ্বাস করতে পারি না।'

'স্যার, আমরা কি শুধু ভারতের কাছে ধরনাই দিচ্ছি? নিজেরা কিছু করছি না? আমাদের হাই কমিশন কি করছে? ওরা সরাসরি প্রফেসর হাসানের সঙ্গে কথা বলছে না কেন?'

'কাল সারারাত অন্তত বিশবার প্রফেসর হাসানকে ফোন করেছেন আমাদের হাই কমিশনার,' বললেন রাহাত খান। 'প্রথমবার ফোন ধরেছিলেন তিনি। বলেছেন, তাঁর কোন বক্তব্য নেই। এরপর আর একটা কলও রিসিভ করেননি। আজ সকালে হাই কমিশনের ফার্স্ট ও থার্ড সেক্রেটারি রিয়াসিতে পৌঁছায়। প্রথমে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা তাদেরকে হোটেলে

ঢুকতেই দেয়নি, কারণ হিসেবে বলেছে ওদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নিষেধ আছে। খবর পেয়ে ঢাকা থেকে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় প্রতিবাদ জানায়। দু'ঘণ্টা পর হোটেলে ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু প্রফেসর হাসান তাদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। শত অনুরোধ করেও ভদ্রলোককে রাজি করানো যায়নি। অগত্যা বাধ্য হয়েই দিল্লীতে ফিরে গেছে তারা। তবে তাদের রিপোর্টে অদ্ভুত একটা তথ্য আছে। প্রফেসর হাসানের সঙ্গে, স্যুইটের ভেতর, দু'জন দেহরক্ষী আছে। দু'জনই তারা শিখ, স্থানীয় এক প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে প্রফেসর হাসানই তাদেরকে ভাড়া করেছেন।'

'তথ্যটা অদ্ভুত এই জন্যে যে ভারত যদি নাটকটা সাজিয়ে থাকে তাহলে প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের বডিগার্ড কেন দরকার হবে, মিলিটারি আর ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট থাকতে?'

'এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।'

সত্যিই তাই, মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাদের করণীয়, স্যার?'

'সে প্রসঙ্গেই আসছি,' বললেন রাহাত খান, এবার ধীরেসুস্থে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন। 'আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোন অবস্থাতেই প্রফেসর হাসানকে ভারত বা পাকিস্তানে ওই যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে দিতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, এজেন্ট পাঠিয়ে তাঁকে খুন করা হবে।'

'ওরা কি তা পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে, আমি জানতে চাইছি, বিসিআইকে টপকে এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির আছে?'

'আছে, জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে সবই করতে পারে ওরা,' বললেন রাহাত খান। 'তাছাড়া ওই গবেষণা সেলের নিরাপত্তা ওদের দায়িত্বেই ছিল। তবে আমি

ওদেরকে আপাতত কিছু না করার পরামর্শ দিয়েছি। বলে দিয়েছি, আগে আমরা ব্যর্থ হই, তারপর তোমরা যা খুশি কোরো।'

ক্ষীণ একটু হাসল রানা, তবে কথা না বলে অপেক্ষা করছে।

'তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হলো, যে-কোন মূল্যে প্রফেসর হাসানকে দেশে ফিরিয়ে আনা,' বললেন রাহাত খান। 'আই রিপিট, যে-কোনো মূল্যে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'গবেষণা সেলে প্রফেসর হাসানের সহকারী হিসেবে কাজ করছিল এক তরুণ নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। দু'জনের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক হলেও, সিকিউরিটির কারণে ওদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ছিল না। ছেলেটার নাম বাদল চৌধুরী। ওই পরিচয়েই যাচ্ছ তুমি, ওটাই তোমার কাভার। বাদলকে আমরা গবেষণা সেল থেকে সরিয়ে অন্য একটা কাজে লাগাচ্ছি, তুমি প্রফেসরকে নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে তাকে কোথাও দেখা যাবে না। এই কাভার নিয়ে গেলে প্রফেসর হাসানের দরজা তোমার জন্যে খুলেও যেতে পারে।'

'প্রতিপক্ষ যদি কেউ থাকে,' বলল রানা, 'তাদের জন্যে বাদল চৌধুরী হয়তো একটা টোপও।'

'রাইট।' রাহাত খানের গম্ভীর উচ্চারণে চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশংসার ভাবটুকু গোপন থাকল না।

'প্রফেসর হাসানের পরিবার সম্পর্কে আমার কিছু জানার নেই?'

ফোল্ডারটা ডেস্ক থেকে না তুলে রানার দিকে একটু ঠেলে দিলেন রাহাত খান। 'বাকি সব তথ্য তুমি এতেই পাবে। সব জানার পর সিদ্ধান্ত নাও কোত্থেকে শুরু করবে কাজটা। তবে আমি চাই আজই শুরু করো। কোনও প্রশ্ন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তাহলে এখন এসো।'

তিন

দু'বছর আগের কথা।

নেলী হাসানের জন্যে ব্যাপারটা কি অগ্নি-পরীক্ষা নয়? একদিকে স্বামী, আরেকদিকে জন্মভূমি ও আত্মার আত্মীয় আপনজনেরা; দুটোর মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিতে হবে তাঁর। একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি স্বর্গ বলা যায়, বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশকে সেই তুলনায় নরক বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। অর্থাৎ তিনি যদি স্বামীর পাশে থাকতে চান, স্বর্গ থেকে পতন ঘটবে তাঁর।

প্রফেসর হাসানের জন্যেও ব্যাপারটা কঠিন পরীক্ষা। নাসায় চুক্তিভিত্তিক একবছরের জন্যে নিয়োগ পেয়ে তিনি যখন কাজ শুরু করেন, সংশ্লিষ্ট সবাই ধরে নিয়েছিল তাঁর গবেষণা শেষ হবার আগে আরও অন্তত তিনবার চুক্তিটা নবায়ন করতে হবে। কিন্তু নাসাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এবং বিজ্ঞানী মহলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়ে মেয়াদ শেষ হবার আগেই গবেষণায় সাফল্য পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নাসা থেকে নতুন প্রস্তাব চলে এসেছে, প্রফেসর হাসান তাঁর পছন্দমত যে-কোন বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন, গাড়ি-বাড়ি-নিরাপত্তা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধে সহ প্রতি বছর পাবেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, প্রতিবার চুক্তি নবায়নের সময় এই টাকা দশ শতাংশ হারে বাড়বে। আর ঠিক এই সময় ঘটনাটা ঘটল, কৃতি সন্তানকে কোলে ফিরে আসার আহ্বান জানাল জননী জন্মভূমি,

বলল—আয় বাপ, তোকে আমরা রাজপুত্রের সম্মান দেব, তোর সব চাহিদা আর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব। কিন্তু মা যদি ভিখারিনী হয়, ছেলে তার কাছে কতটুকুই বা দাবি করতে পারে? বছরে বারো লাখ টাকা? চব্বিশ লাখ? হায়, কোথায় পাঁচ কোটি আর কোথায় চব্বিশ লাখ!

গত রাতে ঘুমাবার আগে স্ত্রীকে সব কথা জানিয়েছেন প্রফেসর হাসান। শুধু খবরটাই দিয়েছেন, নিজের সিদ্ধান্ত কি তা জানাননি, স্ত্রীর মতামতও জিজ্ঞেস করেননি। মিসেস হাসানও শুধু শুনে গেছেন, কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করেননি। সকালে এ-বিষয়ে আর কোন কথা হয়নি। ব্রেকফাস্ট সেরে ল্যাবরেটরিতে চলে এসেছেন প্রফেসর হাসান। এখন শেষ বিকেল, গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। একবার ভাবলেন বোর্ডিং স্কুল থেকে ছেলেটাকে তুলে নেবেন কিনা। নেলীর নে ও ল, আর হাসানের হা নিয়ে ওর ডাক নাম রাখা হয়েছে নেহাল। পনেরোয় পা দিতে যাচ্ছে নেহাল, ওর মতামতেরও একটা দাম আছে। জন্মসূত্রে ও-ও তো বাংলাদেশী। মা মৃত্যুশয্যায় শুনে সপরিবারে ঢাকায় গিয়েছিলেন প্রফেসর হাসান, সেখানেই একটা ক্লিনিকে ভূমিষ্ঠ হয় নেহাল।

না, থাক, ছেলের মতামত পরে নিলেও চলবে, ভাবলেন তিনি। আগে শোনা যাক নেলী কি বলে।

গাড়ি-বারান্দায় স্ত্রীর ছোট্ট অস্টিনটা দেখে একটু অবাক হলেন প্রফেসর, সেটাকে পাশ কাটিয়ে গ্যারেজের সামনে মার্সিডিজ থেকে নামলেন। এই সময় দোতলার জানালা থেকে নেহালের উৎফুল্ল গলা ভেসে এল, 'হাই, ড্যাড! আপনি ওপেক্ষা কোরবেন, গ্যারাজে আমি গাড়ি টুলবে।'

ছেলের বাংলা শুনে হেসে ফেললেন প্রফেসর হাসান, মুখ তুলে দেখলেন নেহালকে, কি এক প্রবল উত্তেজনায় ফর্সা মুখ লালচে আভায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ছেলের পাশে এবার স্ত্রীকেও দেখতে পেলেন। মিসেস হাসান হাসছেন না, ছেলের কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে

স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করছেন বলে মনে হলো।

নেহাল নিচে নেমে আসতে তার হাতে গাড়ি ও গ্যারেজের চাবি তুলে দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন প্রফেসর। লিভিংরুমে অপেক্ষা করছিলেন মিসেস, রোজকার মত স্বামীর টাই খুলে দিলেন। 'হাত-মুখ ধুয়ে সোজা ডাইনিং রুমে চলে যাও, ফ্রিজ খুললেই তোমার নাস্তা পেয়ে যাবে।'

'কখন এল ও?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'দুপুরে। আমিই নিয়ে এলাম।'

স্ত্রী আরও কিছু বলবেন, শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন প্রফেসর। কিন্তু নেলী কিছু বলছেন না দেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথাও বেরুবে নাকি? গাড়ি-বারান্দায় তোমার অস্টিন দেখলাম।'

'হ্যাঁ। নেহালকে নিয়ে ওর নানীর কাছে গিয়েছিলাম,' বললেন নেলী। 'এখন যাচ্ছি ওর নানার কাছে।' নেলীর মা-বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে আজ পনেরো বছর।

'কি ব্যাপার? হঠাৎ?'

হঠাৎই সরে এসে স্বামীকে আলিঙ্গন করলেন নেলী। 'এ তো শুধু বাড়ি বদল নয়, দেশ বদল। অনেক কাজ, এক এক করে সেরে না রাখলে ঝামেলায় পড়ে যাব না!'

'মানে!' রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন প্রফেসর হাসান। তবে অনুভব করলেন মাথা থেকে যেন দশ মনী বোঝা নেমে গেছে।

না, ব্যাপারটা নেলীর জন্যে অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে দেখা দেয়নি। স্বামীকে ভালবাসি, তার সুখই আমার সুখ, অন্তরের অন্তস্তল থেকে এই উপলব্ধি উঠে আসার পর সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধায় ভুগতে হয়নি তাঁকে।

'আজ আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কাল বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে নেব।' স্বামীর বুক থেকে মুখ তুলে হাসলেন। 'তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন? ভেবেছিলে বাংলাদেশে যেতে আপত্তি করব আমি?'

'হ্যাঁ, ভেবেছি,' সত্যি কথাই বললেন প্রফেসর। 'আপত্তি করার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে তোমার। ওখানকার সমাজ এখনও মুক্ত নয়, প্রতিপদে তুমি বিড়ম্বিত হবে। তোমার রুচি ও মূল্যবোধ প্রায় কোন্ কদরই পাবে না। আপত্তি তোলার জন্যে এরকম এক হাজার একটা কারণ পাবে তুমি।'

'জানি।' আবার স্বামীর বুকে মাথা রাখলেন নেলী। 'সব জেনেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাকে ভালবাসি, এটা একটা কারণ, তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। তোমরা যারা মেধাবী, পিছিয়ে পড়া দেশটাকে তোমরা যদি টেনে তোলার ব্যবস্থা না করো তাহলে কে করবে? আমি কি বলছি, বুঝতে পারছ? দেশের ডাকে সাড়া দেয়াটা তোমার জন্যে পবিত্রতম দায়িত্ব, হাসান। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে না চাইতাম বা গিয়েও ফিরে আসি, তবু সেই দায়িত্ব পালন থেকে তোমার সরে আসা চলে না।'

'আই লাভ ইউ, নেলী,' বলে স্ত্রীকে চুমো খেলেন প্রফেসর হাসান। তারপর জানতে চাইলেন, 'নেহালকে বলেছ?'

হেসে ফেললেন নেলী। স্বামীর হাত ধরে টানলেন। 'এসো, তোমার ছেলে আমাকে কি রকম লজ্জায় ফেলে দিয়েছে দেখে যাও।' স্বামীকে নিয়ে নেহালের ঘরে ঢুকলেন। নেহালের টেবিলে এক গাদা বাংলা কবিতার বই দেখলেন প্রফেসর, তারমধ্যে সঞ্চয়িতাও রয়েছে। 'স্কুল থেকে আসার পথে ওকে আমি বললাম আমরা সম্ভবত বাংলাদেশে চলে যাচ্ছি। ব্যস, তোমার ছেলে ইংরেজি বাদ দিয়ে সেই থেকে বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছে। গাড়ি থামিয়ে বুকস্টলে নিয়ে গেল আমাকে। এক গাদা কবিতার বই কিনল। জিজ্ঞেস করল, বাংলার সবচেয়ে বড় কবি কে? বললাম। টেগোর। বাড়িতে ঢুকেই বলে টেগোরের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও। বললাম, আমি বানান করে করে পড়তে পারি, তাতে আবৃত্তি করা সম্ভব নয়। উত্তরে কি বলল শুনবে? বলল, ''আব্বুর যউগ্যো ইসটিরি হটে হলে আরও তেগ সিকার করটে

হোবে টুমাকে"। তারপর জানতে চাইল, বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম কি? আমি তো লজ্জায় মরে যাই…'

'কাজী নজরুল ইসলাম…'

'আর টাহার গানই কি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীট করা হয় নাই?' দোরগোড়ায় হাজির হয়ে জানতে চাইল নেহাল।

এগিয়ে এসে ছেলের মাথায় হাত রাখলেন প্রফেসর। 'না, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা নজরুল নন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে নেহাল, তোমার বাংলাদেশে যাওয়াটা কি উচিত হবে? সামনের বছর তোমার ফাইনাল পরীক্ষা না?'

নেলী বললেন, 'তুমি কি ওকে এখানে রেখে যেতে চাও?'

'সেটাই কি ভাল হত না?'

'গেলে আমরা সবাই যাব, হাসান,' জোর দিয়ে বললেন নেলী। 'আমি এমনকি এখানে ফেরার কোন রাস্তাও রাখতে রাজি নই। তোমার আমেরিকান পাসপোর্ট সারেন্ডার করো তুমি। ব্যবস্থা করো আমি যাতে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাই। নেহালের লেখাপড়া? ওদিকটা আমাকে সামলাতে দাও। কালই আমি শিক্ষা বোর্ডে যাব। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা বিশেষ ব্যবস্থায় ওখান থেকে স্কুল ফাইনাল দেয় বলে শুনেছি, তা যদি সত্যি হয় তাহলে নেহালও দিতে পারবে…'

দুই হাত মাথার ওপর তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন প্রফেসর। 'সারেন্ডার করলাম। ঠিক হ্যায়, আমরা সবাই যাচ্ছি।'

'তুমি হায় বলছ কেন?' জিজ্ঞেস করল নেহাল। 'হায় মানে তো অ্যালাস! আর ইউ ফিলিং স্যাড অর সরি?'

'ওহ্, নো!' বলে হেসে উঠলেন প্রফেসর হাসান। 'আইয়্যাম প্রাউড অভ ইউ অ্যান্ড ইয়োর ওয়ান্ডারফুল মাদার, আই য়্যাম ফীলিং গ্রেট!'

খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেন প্রফেসর।

চার

চার্টার করা প্লেনে সন্ধ্যার খানিক আগেই খুলনায় পৌঁছে গেল রানা। ইতিমধ্যে ফোল্ডারটা পড়া হয়ে গেছে। প্রফেসর হাসান আর তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য রীতিমত ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে ওকে।

বাংলাদেশ সরকার প্রফেসর হাসানকে বছরে পঞ্চাশ লাখ টাকা বেতন, থাকার জন্যে একটা বাড়ি ও ব্যবহারের জন্যে একটা গাড়ি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মাসিক বেতন পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি নিতে রাজি হননি তিনি। আর তাঁর স্ত্রী নেলী ঢাকায় এসেই ইংরেজি শেখাবার জন্যে একটা কোচিং সেন্টার খোলেন, সেখানে শুধু স্কুল-কলেজের স্ট্যান্ড করা ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারত, এবং ইংরেজি শেখানোর বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে কোন ফি নিতেন না। গত ছ'মাস হলো নেহালকে নিয়ে খুলনায় বসবাস করছেন ভদ্রমহিলা, এখানেও তিনি বিনা পয়সায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইংরেজি শেখাচ্ছেন।

প্রশ্ন হলো, এরকম নির্লোভ একজন মানুষ কি কারণে জন্মভূমি ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইবেন? অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্ররোচনায় মানুষ লোভী হয়ে ওঠে, অন্যায়-অবৈধ পথে পা বাড়ায়, কিন্তু এক্ষেত্রে তো সেরকম ঘটেছে বলে মনে হয় না, কারণ প্রফেসরের মত তার স্ত্রীও সাদামাঠা জীবনে অভ্যস্ত, ভোগের চেয়ে তাঁর ত্যাগেই বেশি আনন্দ। তাহলে?

এরকম অদ্ভুত একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে কারণটা কি?

আরেকটা ধাঁধা হলো, দাম্পত্য জীবনে দু'জনকেই সুখী বলা হয়েছে, অথচ স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে সঙ্গে নেননি প্রফেসর হাসান, শুধু একা নিজের জন্যে ভারতের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?

ঠিকানা দিতে ট্যাক্সি ড্রাইভার সরাসরি বাড়িটার সামনে পৌঁছে দিল ওকে। পাশেই একটা বিরাট মাঠ, একদল কিশোর ফুটবল খেলছে। বাড়িটা একতলা, ছোট্ট সাইনবোর্ড ঝুলছে গেটের পাশে—'নেলী'স কোচিং সেন্টার'। গেট খোলা দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। কয়েকটা ধাপ টপকে বারান্দায় উঠে কলিংবেল বাজাল।

পায়ের আওয়াজ পেল রানা। দরজা খুলে গেল। 'ইয়েস? হাউ ক্যান আই হেলপ ইউ?'

'মিসেস নেলী হাসান?' জিজ্ঞেস করল রানা। একেবারে হকচকিয়ে গেছে ও, মিসেস হাসান এতই সুন্দরী! মহিলা মাথা ঝাঁকাতে বলল, 'আমি বাদল চৌধুরী, আপনার স্বামীর সঙ্গে কাজ করি—করতাম। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করব ভেবে এলাম।'

'আলাপ করবেন?' মিসেস হাসান ভুরু কোঁচকালেন।

স্মিত হাসিটা মুখে ধরে রাখল রানা। 'হ্যাঁ। প্রফেসর হাসান আমার সিনিয়র হলেও, আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমার তো মাথায়ই ঢুকছে না এরকম একটা কাজ কেন করলেন তিনি!'

'কিন্তু পুলিস আর এনএসএ-র লোকেরা তো এরইমধ্যে আমার সঙ্গে বহুবার আলাপ করে গেছে। আমার যা বলার ছিল সবই ওদেরকে বলেছি আমি।' মিসেস হাসান দরজাটা পুরোপুরি খুলছেন না।

'হ্যাঁ, তা বলেছেন,' বলল রানা। মিসেস হাসানের বৈরী আচরণের কারণটা বুঝতে পারছে ও। একে তো সন্তান ও তাঁকে

ফেলে পালিয়ে গেছে স্বামী, তার ওপর পুলিসী ঝামেলা। এখন আবার কোথাকার কোন সহকর্মী এসেছে জ্বালাতে। 'তবু যদি দয়া করে একটু সময় দিতেন...'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস হাসান, হাত দিয়ে গাউনের ভাঁজ ঠিক করলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।' দরজাটা পুরোপুরি খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

কার্পেট মোড়া হলরুমে ঢুকল রানা। মিসেস হাসান পথ দেখিয়ে লিভিংরুমে নিয়ে এল ওকে। বাড়ির ফার্নিচার খুবই সাদামাঠা, মোটেও দামী কিছু নয়। কার্পেটগুলো পুরানো মনে হলো। ইঙ্গিতে ওকে একটা ডিভান দেখিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসলেন মিসেস হাসান। 'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি আসলে এসেছি বিবেকের তাড়নায়,' একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল রানা। 'এক সঙ্গে কাজ করতে গেলে অনেক সময় ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মান-অভিমান তো হতেই পারে, তাই না? প্রফেসর হাসানকে আমরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম নাসার মত বিশাল একটা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কোন দুঃখে তিনি এখানে এলেন। সেজন্যেই ভাবছি, আমাদের এ-ধরনের কোন কথায় বা ব্যবহারে রাগ বা অভিমান হওয়াতেই তিনি চলে গেলেন কিনা।'

মিসেস হাসান মাথা নাড়লেন। 'আমার তা মনে হয় না।'

রানা এখন আর হাসছে না। 'তাহলে কি কারণে এভাবে চলে গেলেন তিনি?'

'ব্যাপারটা আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, মি. ...কি যেন নাম বললেন?'

'বাদল চৌধুরী।'

'বিশ্বাস করুন, মি. চৌধুরী, ব্যাপারটা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, এখনও আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। তবে অফিসে কে কি বলল, আর তাতে রাগ করে চলে গেল—এ সম্ভব নয়। কাজেই আপনার বা আপনাদের কারও অপরাধবোধ করার কোন কারণ

আছে বলে আমি মনে করি না।'

'অফিসে যদি কিছু ঘটে না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বাড়িতে...'

রানাকে প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে মিসেস হাসান বললেন, 'বাড়িতেও কিছু ঘটেনি, মি. চৌধুরী।' বলছেন বটে ঘটেনি, তবে ভদ্রমহিলা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বিয়ের আঙটিটা দুই আঙুলে ধরে অনবরত ঘোরাচ্ছেন তিনি।

রানার পরা চশমাটা খুব ভারী লাগছে নাকে। তবে তাতে মনে রাখতে সুবিধে হচ্ছে কার ভূমিকা নিয়ে এখানে এসেছে ও। 'তারমানে কি আপনি দাবি করছেন যে আপনাদের দাম্পত্য জীবনে কোন রকম বিরোধ বা অশান্তি ছিল না?'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস হাসান। 'ঠিক কি বলতে চান আপনি?'

'না, মানে, ঢাকার সরকারী বাড়ি ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে আপনি একা খুলনায় বাস করছেন, এটা একটু অস্বাভাবিক নয়?'

'দেখুন, মি. চৌধুরী, আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না, প্লীজ। আমার স্বামী যে কারণেই দেশ ত্যাগ করে থাকুন, কারণটা অন্য কোথাও সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের দাম্পত্য জীবনে নয়।'

'এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না,' নরম সুরে বলল রানা। 'প্রফেসর হাসান খুলনায় বাড়ি কিনলেন কেন? এখানে আপনাকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্যে? সত্যি কথা বলুন, মিসেস নেলী। আমরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব। প্রফেসর কি কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন?'

'আপনারা সাহায্য করতে পারবেন? কি সাহায্য করতে পারবেন?' হঠাৎ রেগে গেলেন মিসেস হাসান। 'আমি আমার স্বামীকে ফেরত চাই। আপনারা তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন?'

'ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা সেটা বলতে পারবে বাংলাদেশ সরকার,' বলল রানা। 'আমরা আপনাকে অন্যভাবে সাহায্য

করতে পারি।'

'কিভাবে?'

'এই ধরুন, প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে,' বলল রানা। 'তাতে অন্তত আপনি একটা ব্যাখ্যা পাবেন কি কারণে তিনি এভাবে চলে গেলেন।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মনে করি না আপনাদের কোন সাহায্য আমার দরকার আছে।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'শেষ পর্যন্ত যদি প্রফেসর হাসানকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, আপনি কি ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে যাবেন?'

গাউনে হাত ঘসে তালুর ঘাম মুছলেন মিসেস হাসান। কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। 'আমি এখন বাংলাদেশী। এখানেই আমার স্থান।'

'ভারতে যদি না যান, তাহলে কি করবেন?'

'ডিভোর্স করব ওকে। চেষ্টা করব আমার আর ছেলের জন্যে অন্য একটা জীবন বেছে নিতে।'

'আই সী।' রানা বুঝতে পারছে, এখান থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। যে-কোন কারণেই হোক মিসেস হাসান মুখ খুলতে রাজি নন।

'আমি এখন কিচেনে যাব,' মিসেস হাসান বললেন। 'আপনার আলাপ যদি শেষ হয়ে থাকে...'

ডিভান ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'হ্যাঁ, এবার উঠব আমি। আর শুধু একটা প্রশ্ন, মিসেস হাসান। আপনি কি জানতেন প্রফেসর হাসান কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন?'

'কি করে জানব!' প্রতিবাদের সুরে বললেন নেলী। 'গত ছ'মাসে দু'বার মাত্র খুলনায় এসেছে ও, রাতটুকু কাটিয়ে আবার সকালেই চলে গেছে—সাংসারিক জরুরী বিষয়েই কথা হত না, অফিসের কথা তুলব কখন!'

রানা কিছু বলতে যাবে, এই সময় বাড়ির পিছন দিকে কোথাও একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। কয়েক সেকেন্ড পর লিভিংরুমে ঢুকল কিশোর এক ছেলে। 'মম্, আমি...' রানাকে দেখে স্থির হয়ে গেল সে। তারপর চট করে মায়ের দিকে একবার তাকাল।

'নেহাল,' মিসেস হাসান বললেন, আবার তাঁকে নার্ভাস দেখাল। 'ইনি মি. বাদল চৌধুরী। তোমার ড্যাডির সঙ্গে কাজ করেন। এখানে এসেছেন তোমার ড্যাডি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, নেহাল? উনি ঢাকা থেকে আসছেন, তোমার ড্যাডি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে।' শেষ কথাগুলো জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন।

'বুঝতে পারছি, মম্,' বলল নেহাল। রানার দিকে তাকাল সে, মায়ের মত তাকেও অত্যন্ত সতর্ক আর নার্ভাস দেখাচ্ছে।

'হ্যালো, নেহাল।' মিষ্টি করে হাসল রানা।

'হ্যালো,' জবাব দিল ছেলেটা। কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। হাতের গ্লাভস খুলে অকারণে মোচড়াতে শুরু করল। রানা লক্ষ করল, মায়ের সঙ্গে প্রচুর মিল আছে চেহারায়।

'তুমি তাহলে ফুটবল খেলো? গোলকীপার?'

'ইয়েস, স্যার!'

একটা সুযোগ নিল রানা। দু'পা এগিয়ে মা ও ছেলের মাঝখানে চলে এল। 'ঠিক আছে, তোমাকেও প্রশ্নটা করি, নেহাল। তুমি কি জানো, তোমার আব্বু কেন এভাবে চলে গেলেন?'

চোখ বুজল ছেলেটা। 'আমরা আসলে বুঝতেই পারছি না ড্যাড এরকম একটা কাজ কেন করলেন। আমাদের বাড়িতে তো কোন রকম অশান্তি ছিল না, সবাই আমরা খুবই সুখে ছিলাম–নিশ্চয় অফিসে কিছু একটা ঘটে থাকবে।' বলার ভঙ্গি আর সুরেই বোঝা যায় ভাল ভাবে মুখস্থ করা।

'তোমার কোন ধারণা আছে অফিসে উনি কি কাজ করতেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল নেহাল। 'নাহ্।'

মিসেস হাসান চেয়ার ছাড়লেন। 'এবার আপনি আসুন, মি. চৌধুরী।'

কোমরে হাত রেখে মা ও ছেলেকে এক মুহূর্ত দেখল রানা। কি যেন একটা মিলছে না এখানে। যতটুকু স্বীকার করছে, দু'জনেই তারচেয়ে অনেক বেশি জানে। রানা ধারণা করল, দুটোর একটা হতে পারে। হয় এরা প্রফেসর হাসানের কাছে চলে যাবে, নয়তো তাঁর চলে যাবার পিছনে এরাই দায়ী। তবে মুখ খোলানো সম্ভব নয়। ওকে ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। যে প্রশ্নই করা হোক, মুখস্থ করা বানানো উত্তর পাওয়া যাবে। 'মিসেস হাসান,' তবু মুখ খোলাবার শেষ একটা চেষ্টা করল রানা, 'কাল আমি প্রফেসর হাসানের সঙ্গে দেখা করার জন্যে কাশ্মীরে যাচ্ছি। তাঁকে আপনি কোন মেসেজ দেবেন?'

মিসেস হাসান চোখ মিটমিট করলেন, মুহূর্তের জন্যে থতমত খেতে দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সতর্ক ভাবটা ফিরে এল চোখে-মুখে। 'না, কোন মেসেজ নেই।'

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে ফেরার পুরোটা সময় উসখুস করল উদ্বিগ্ন রানা। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পায়নি ও। মা ও ছেলে, অদ্ভুত একটা জোড়া। কথা বলার সময় একবারও রানার মনে হয়নি স্বামীকে হারিয়ে কাতর হয়ে পড়েছেন ভদ্রমহিলা। বললেন, কোন মেসেজ নেই। মেসেজ থাকার কথা নয় যদি তিনি স্বামীর কাছে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাও তো মনে হলো না। ভাবটা যেন, দু'জনেই জানে প্রফেসর হাসান চিরকালের জন্যে চলে গেছেন, কোনদিন আর ফিরবেন না, এবং সে-ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথাও নেই। না, গভীরে আরও কী যেন একটা লুকিয়ে আছে। ওর চোখে সেটা ধরা পড়ছে না।

পাঁচ

পরদিন সকালের ফ্লাইট ধরে কোলকাতায় চলে এল রানা। বাদল চৌধুরীর পাসপোর্ট করাই ছিল, শুধু ফটোটা বদল করা হয়েছে। নতুন ফটোতে হুবহু বাদল চৌধুরীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি, আর আদি ও অকৃত্রিম মাসুদ রানার কোন ছাপই নেই তাতে। বাদল চৌধুরী মোটাসোটা হওয়ায় মুখের ভেতর আর কোমরে দু'রকম প্যাড ব্যবহার করছে রানা, কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে বিড়ালাক্ষী হতে হয়েছে, রাতারাতি গজানো যাবে না জেনেই বিসিআইএ-র টেকনিকাল টীম একজোড়া হিটলারী গোঁফ তৈরি করে বসিয়ে দিয়েছে নাকের নিচে।

সমস্যা হবার কথা ছিল ভিসা নিয়ে, রাহাত খানের দূরদৃষ্টির কল্যাণে তাও হয়নি। প্রফেসর মইনুল হাসান ডিফেক্ট করেছেন, এ-খবর পাবার পর প্রকৃত পরিস্থিতি জানার জন্যে সারারাত সোহেলকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি, তাসত্ত্বেও সকালবেলাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন প্রফেসর হাসানকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কাকে পাঠাবেন, তার কাভার কি হবে। বাদল চৌধুরী কাশ্মীরে যেতে চায় শুনে ভারতীয় হাই কমিশন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এক ঘণ্টার মধ্যেই ভিসা ইস্যু করেছে।

কোলকাতা থেকে কাশ্মীর বা জম্মুতে যাবার সরাসরি কোন ফ্লাইট নেই। বাংলাদেশ বিমানের দিল্লী ফ্লাইট ধরল রানা, দিল্লীতে প্লেন বদলে জম্মুতে যাবে। কোলকাতা থেকেই এয়ার ইন্ডিয়ার

একটা টিকিট বুক করে রাখল ও। কাঁটা ঘুরিয়ে বাংলাদেশের বদলে ভারতীয় সময়কে বন্দী করল হাতঘড়িতে, হিসেব কষে দেখল স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে বারোটায় জম্মুতে পৌঁছাবে ও।

বিমানে চড়ার পরপরই রানার মনে হলো ওর ওপর কেউ নজর রাখছে। রাখারই কথা। নেলী যদি স্বামীর কাছে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, আর প্রফেসর হাসানের মত তাঁকেও যদি ভারতীয় ইন্টেলিজেন্ট প্ররোচিত করে থাকে, তাঁর মাধ্যমে খবরটা ইতিমধ্যে পাচার হয়ে গেছে। তারও আগে ওরা খবর পেয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের ভিসা সেকশন থেকে। সীটের দিকে এগোবার সময় দু'পাশে চোখ বুলাল রানা। অনেক আরোহীই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, তাদের মধ্যে তরুণীর সংখ্যাই যেন বেশি; দু'একজন ভারি সুন্দর, আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে করে। কল্পনার লাগাম একটু ঢিল করল রানা–ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের যে মেয়েটি ওর ওপর নজর রাখছে সে নিশ্চয়ই পরমাসুন্দরী, কিন্তু দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে একটি মাত্র কারণে: প্রথমদর্শনেই ওর প্রেমে পড়ে যাবে বেচারী।

শালা! মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করল রানা।

কোন পরমাসুন্দরী নয়, এমনকি কোন তরুণীও নয়, প্রায় হনুমানের মত মুখ, রঙটা কয়লার সঙ্গে বদলে নেয়া যাবে, প্রকাণ্ড এক দৈত্য জুটল ওর কপালে; প্লেন টেক-অফ করার পরপরই লোকটাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে শনাক্ত করল রানা। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট হবে। আইএসআই হওয়াও বিচিত্র নয়, তবে সম্ভাবনা কম। রানা আশা করছে ওদের সঙ্গেও দেখা হবে, তবে আরও পরে।

কোন রাখ-ঢাক নেই, হনুমানজি প্রকাশ্যেই রানার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে। তা করুক। সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা, ঘুম এলে তাড়াবে না।

দিল্লীতে এক ঘণ্টার যাত্রাবিরতি, ল্যান্ড করার পর জানা গেল

জম্মুর ফ্লাইট আরও এক ঘণ্টা দেরিতে টেক-অফ করবে। বাংলাদেশ বিমান থেকে নামার পর ট্র্যানজিট যাত্রীদের বিমানবন্দর ত্যাগ করতে নিষেধ করা হলো, পরামর্শ দিয়ে বলা হলো সময়টা যেন তারা টার্মিনাল ভবনে কাটায়।

রানওয়ে ধরে সেদিকেই রওনা হলো রানা। ওর পাশেই হনুমানজি। রানার সঙ্গে মেপে মেপে পা ফেলছে, একই ছন্দে। নিজ এলাকায় প্রতিটি মানুষই আসলে দুঃসাহসী বাঘ!

'মি. বাদল চৌধুরী?' হঠাৎ হনুমানজি ডান হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আমি অভিজিৎ খের। ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, আপনার অফিশিয়াল প্রোটেক্টর–বুঝলেন না!'

বাড়ানো হাতটা ধরতে ইতস্তত করছে রানা। 'কে বলল, আমার প্রোটেকশন দরকার?'

হনুমানজির ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটল, ঠিক যেন ধূর্ত শিয়াল হাসছে। 'এই মুহূর্তে হয়তো দরকার নেই, তবে হবে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'জম্মু আর কাশ্মীর হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা–বুঝলেন না!' বলল অভিজিৎ খের। 'আইএসআই, স্থানীয় গেরিলা, পাকিস্তানী জঙ্গি ইনফিলট্রেইটর সব গিজগিজ করছে ওখানে। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, কাজেই আপনাকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।'

হনুমানজির হাতটা ধরে একবার ঝাঁকাল রানা। 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ। আপনি একা?'

'টার্মিনাল ভবনের ভেতর ম্যাকডোনাল্ডের একটা শাখা রেস্তোরাঁ আছে, আমার সহকারী আপনার জন্যে একটা টেবিল নিয়ে অপেক্ষা করছে ওখানে,' সবিনয়ে বলল অভিজিৎ খের। 'দু'ঘণ্টা এমন আর কি, গল্প করে কাটিয়ে দেবেন।'

'আপনাদের সঙ্গে আমার আবার গল্প কি!' অসহায় ও আড়ষ্ট দেখাল রানাকে। 'আপনাদের তো আমি চিনিই না। তাছাড়া, গল্প-

টল্প আমার আসে না। শুধু একটা বিষয়ে কথা বলতে পারি আমি—আমার রিসার্চ নিয়ে—কিন্তু সে-সব তো অতি জটিল বিষয়, এবং গোপনীয়। কিছু বলে ফেললে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অপরাধ হবে।'

'না-না-না!' চোখ বিস্ফারিত, প্রবলবেগে মাথা নাড়ল হনুমানজি। 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা পবিত্র আমানত, মি. চৌধুরী। ও-সব নিয়ে কারও সঙ্গেই আপনি আলাপ করতে পারেন না। আপনি বলতে শুরু করলে আমরাই বাধা দেব, কারণ দেয়ালের তো কান আছেই, আমাদের এখানে আবার সব কানই পাকিস্তানী। তবে এমন এক জায়গায় টেবিল বাছাই করতে বলেছি, আপনার কোন কথাই আইএসআই শুনতে পাবে না।'

'ও, আচ্ছা।'

'ওরা আসলে ব্যাড এলিমেন্ট, বুঝলেন না!' অভিজিৎ খের রানার দেখাদেখি আবার হাঁটতে শুরু করল। 'মনে নেই, কি মারটা দিল একাত্তর সালে? আর ভারত?' রানার বুকে টোকা মারল, তারপর বুড়ো আঙুল তাক করল নিজের বুকে। 'আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধুর কাজ করেছি। ওরা শত্রু, আমরা ভাই। ভাইকে আবার অবিশ্বাস কি? ভাইকে বিশ্বাস করে সব কথা বললেও ক্ষতি নেই, বুঝলেন না। ঘরের কথা ঘরেই থাকবে, পরের কানে উঠবে না।'

ম্যাকডোনাল্ডের ভেতর নির্জন এক কোণে টেবিলটা, রানাকে নিয়ে অভিজিৎ খেরকে আসতে দেখে যে লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তাকে দেখলে যে-কেউ মুগ্ধ হবে। সুপুরুষ, সুদর্শন; নড়াচড়ায় আভিজাত্য। অভিজিৎ খের পরিচয় করিয়ে দিল, 'হরভজন সিং, ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স, আমার সহকর্মী—বুঝলেন না!'

ঠোঁটে মৃদু হাসি, রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সিং। হাতটা ছেড়ে দিয়ে রানাকে বসতে অনুরোধ করল, তারপর ইঙ্গিতে

ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল—ফ্রায়েড চিকেন আর কফি।

'তুমিই শুরু করো, মিস্টার,' বলল খের। 'মিস্টার চৌধুরীকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, যে-কোন কথা আমাদেরকে বলা যায়, কারণ আমরা পরীক্ষিত বন্ধু। কোনভাবেই তা পাকিস্তানীদের কানে যাবে না।'

'আপনি আমাদেরকে বন্ধু বলে মনে করুন, প্লীজ,' মার্জিত, অমায়িক ভঙ্গিতে বলল হরভজন সিং। 'ভাববেন না আমরা আপনাকে ইন্টারোগেট করছি। আমরা শুধু জানতে চেষ্টা করছি, আপনার কোন সাহায্য দরকার কিনা।'

'সত্যি, আপনাদের হৃদ্যতায় আমি মুগ্ধ!' বলল রানা। 'কিন্তু আমাকে সাহায্য করার জন্যে আপনাদের এত আগ্রহ আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।'

'মি. চৌধুরী, আমরা শুধু জানি আপনি প্রফেসর হাসানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন দেখা করতে যাচ্ছেন তা জানি না।' সিঙের ঠোঁটে মিষ্টি হাসি; ভাবটা যেন, রানা একটা কৌতুক করেছে, তার জবাব না দিলেও চলবে।

'তিনি আমার গুরু, আমি তাঁকে রিসার্চে সাহায্য করছিলাম,' বলল রানা। 'গুরু এখানে এসে বলছেন তিনি আর দেশে ফিরবেন না, তাই আমি জানতে যাচ্ছি তাঁর কোন সাহায্য লাগবে কিনা।'

'বেশ, বেশ। শুনে খুশি হলাম,' বলল সিং। 'তারমানে আপনি নিজের গরজে এসেছেন, তাই না? বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আপনার এই সফরের কোন সম্পর্ক নেই?'

'না, কোন সম্পর্ক নেই,' বলল রানা।

'সরকার জানে আপনি আসছেন?'

'জানতে পারে—হ্যাঁ, জানে।'

'অফিসাররা আপনাকে কোন পরামর্শ দেননি? সরাসরিই জিজ্ঞেস করি, ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা আপনাকে ব্রিফ করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছে,' বলল রানা। 'তবে তাদের পরিচয় আমি জানি

না। আমাকে বলল, দেখা করা সম্ভব হলে আমি যেন প্রফেসরকে দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দিই।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই পরামর্শই তো দেবেন তাঁরা,' বলল সিং। 'এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। তো, আপনার ইচ্ছেটা কি, মি. চৌধুরী? প্রফেসরকে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে চান?'

'দেখুন, আমরা হলাম বিজ্ঞানী, আমাদের নীতি ও আদর্শ আর দশজনের সঙ্গে মিলবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানীদের কোন দেশ নেই, কারণ তাদের লক্ষ্য হলো মানবজাতির কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা, কাজেই একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে তাদেরকে বেঁধে রাখা যাবে না। আমার গুরু যদি ভেবে থাকেন বিজ্ঞান চর্চার জন্যে তাঁর দেশ বদল করাটা জরুরী, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে।'

'আপনার জ্ঞান, দর্শন ও অন্তর্দৃষ্টি সত্যি মুগ্ধ হবার মত,' বলল সিং। 'আপনার মত মানুষের কোন উপকারে যদি লাগি আমরা, সেটাই হবে পরম প্রাপ্তি। মি. চৌধুরী, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি—প্রফেসর মইনুল হাসান রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ায় ভারত সরকার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের ধারণা, এর পিছনে আমাদের হাত আছে। কিন্তু ধারণাটা সত্যি নয়। আমরা শুধু বিস্মিতই হইনি, এর কোন কারণও খুঁজে পাচ্ছি না। কেন? কি কারণে এই ডিফেকশন? প্রফেসর নির্লোভ মানুষ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে কত রকম সুযোগ-সুবিধে দিতে চেয়েছে, তার অতি অল্পই তিনি নিয়েছেন। তাহলে কেন তিনি আমাদের এখানে আশ্রয় চাইবেন?'

'যতটুকু বুঝতে পারছি,' বলল রানা, 'আপনারা চান দেখা হলে প্রফেসরকে আমি এই প্রশ্নটা করি, এই তো?'

'হ্যাঁ, প্লীজ!' আবেদনের সুরে বলল হরভজন সিং। 'তিনি যেহেতু আশ্রয় চেয়েছেন, তাই আমরা তাঁকে এ-ধরনের স্পর্শকাতর একটা প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করতে পারি না। দু'বার

হয়েছে, প্রথমে তিনি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছেন, পরে বলেছেন ভারত যদি আশ্রয় না দেয় তাহলে তিনি আবার আমেরিকায় ফিরে যাবেন।'

রানাকে চিন্তিত দেখাল। 'দেখুন, আগে আমাকে জানতে হবে প্রফেসরকে নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন। আপনারা কি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করে, আবার তাঁকে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করবেন?'

'এটা খুবই নাজুক প্রশ্ন,' বলল হরভজন সিং। 'বাংলাদেশ বন্ধু রাষ্ট্র, আমরা তার অনুরোধ ফেলতে পারব না। কিন্তু প্রফেসরের ব্যক্তি স্বাধীনতাতেই বা হাত দিই কিভাবে!'

'আরও পরিষ্কার জবাব চাই আমি,' বলল রানা। 'আপনারা যদি প্রফেসরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠান, আমার তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোন প্রয়োজনই নেই।'

'মানে!' সিং ও খের একযোগে জানতে চাইল।

'আপনারা আসলে ভাল করে আমার কথা শোনেননি,' বলল রানা। 'প্রথমেই তো বললাম যে আমি এসেছি প্রফেসরের কোন সাহায্য লাগবে কিনা জানতে। সাহায্য মানে গবেষণায় সাহায্য। তিনি যদি এখানে আশ্রয় পান তো এখানেই, আর যদি দেশে ফিরে যান তো দেশেই। সাহায্য করা নিয়ে কথা, তা সে যেখানেই হোক।'

'এর মানে কি প্রফেসর হাসান ভারতে থেকে গেলে আপনিও তাঁর সঙ্গে থেকে যাবেন?' ধীরে ধীরে জানতে চাইল অভিজিৎ খের।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সেক্ষেত্রে আমাকেও তাঁর মত এখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে হবে।'

খের ও সিঙের প্রতিক্রিয়া হলো দেখার মত। খের মাত্রা ছাড়ানো উল্লাসে অবশ হয়ে গেল, শুধু ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, কান খাড়া ছিল বলেই শুনতে পেল রানা: সে বলছে, 'জয় ভারত মাতা

কী জয়! জয় ভারত মাতা কী…'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সিং, স্মার্ট ভঙ্গিতে স্যালিউট করল রানাকে, হাত বাড়াল আরেকবার হ্যান্ডশেক করার জন্যে। তবে তার আচরণের সঙ্গে চোখের দৃষ্টি রানা ঠিক মেলাতে পারল না, সেখানে কেমন যেন একটা সতর্ক ভাব আর সন্দেহের ছায়া। চেয়ার ছেড়ে হাতটা ধরল ও, তালুতে খসখসে কি যেন একটা ঠেকল—ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বলে মনে হলো। হাতটা ছেড়ে দিয়ে ওকে বুকে টেনে নিল হরভজন সিং।

আবার যখন চেয়ারে বসল ওরা, রানা দেখল অভিজিৎ খের নিঃশব্দে কাঁদছে।

ওর চোখে বিস্ময় আর প্রশ্ন দেখে হরভজন সিং মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মি. চৌধুরী, এ হলো আমাদের দেশপ্রেমের প্রকাশ। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল, আপনাকে ভারতে থেকে গিয়ে প্রফেসর হাসানকে গবেষণায় সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়া। আপনি নিজেই সে ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা সত্যি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। অভিজিৎ কাঁদছেন সেই আনন্দেই…'

'কিন্তু আপনার চোখে পানি নেই,' বলল রানা। 'আপনি কাঁদছেন না।'

'সব চোখের পানি দেখা যায় না, মি. চৌধুরী,' বলল সিং।

রুমালে চোখ মুছে হনুমানজি ওরফে অভিজিৎ খের বলল, 'দুঃখিত, এরকম আবেগে আক্রান্ত হওয়া আমাদের সাজে না। চৌধুরীজি, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব! আসলে ব্রিটিশরা শুধু মানচিত্রেই দাগ কাটতে পেরেছে, প্রকৃত অর্থে হিন্দুস্তানকে ভাগ করতে পারেনি। ভারত যে আজও অখণ্ড আছে, আপনাদের মত কিছু কিছু মানুষের স্পিরিট মাঝে-মধ্যেই তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমরা সবাই ভারতমাতার সন্তান, সবাই হিন্দুস্তানী। সিং, এবার কিছু কাজের কথা হোক।'

'আপনি নিশ্চয়ই খালি হাতে আসেননি, মি. চৌধুরী?' জিজ্ঞেস

করল হরভজন সিং। 'বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট, কোন্ এক্সপেরিমেন্টে কি কি পার্টস ও উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, যন্ত্রটার সম্ভাব্য ফর্মুলা ইত্যাদি সবই তো কাগজে লেখা থাকার কথা, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'কেন, প্রফেসর হাসান ওগুলো সঙ্গে করে আনেননি?'

অভিজিৎ খের ব্যাকব্রাশ করা চুলে আঙুল চালাল। 'প্রফেসর হাসান বলছেন, কাগজ-পত্র কিছুই তিনি সঙ্গে করে আনেননি। ও-সব নাকি তাঁর কোন প্রয়োজনও হবে না, কারণ সব তাঁর মাথাতেই সংরক্ষিত আছে। কিন্তু...'

বাদল চৌধুরী ওরফে মাসুদ রানাকে বিচলিত দেখাল। 'উনি নিয়ে এসেছেন ভেবে আমিও তো কিছু আনিনি! অবশ্য ইচ্ছে করলেই যে আনতে পারতাম, তা বোধহয় ঠিক নয়। সরকারী লোকজন গবেষণা সেল-এর অফিস আর ল্যাবে কড়া পাহারা বসিয়েছে। তাছাড়া ল্যাবের যে দেরাজে কাগজ-পত্র রাখা হয় তার চাবি তো প্রফেসরের কাছে থাকত, তিনি সেটা কোথায় রেখে এসেছেন কে জানে।'

'এই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে আমাদের জানাতে হবে,' বলল খের। 'প্রফেসর বলছেন বটে কাগজ-পত্র ছাড়াই এখানে তিনি গবেষণার কাজ শুরু করতে পারবেন, কিন্তু...এ-ব্যাপারে আপনার কি ধারণা, চৌধুরীজি?'

'প্রফেসরের ওপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, কাগজ-পত্র থাকলে কাজটা করতে অনেক কম সময় লাগবে। যদি পারেন ওগুলো আনাবার ব্যবস্থা করুন আপনারা।' রানা জানে, বিসিআই এজেন্টরা ওখানে ওত পেতে বসে আছে, কেউ কিছু চুরি করতে গেলেই খপ করে ধরবে। শুধু ওখানে নয়, প্রফেসরের খুলনার বাড়ির ওপরও নজর রাখা হচ্ছে, মিসেস হাসান যাতে নেহালকে নিয়ে সীমান্ত পেরুতে না পারেন।

'কিভাবে আনাবার ব্যবস্থা করব?' জিজ্ঞেস করল খের। 'আপনিই তো বলছেন কড়া পাহারা দিচ্ছে ওরা।'

'কেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আবিষ্কার হতে যাচ্ছে, এ খবর আপনারা জানতেন না?' রানাকে বিস্মিত দেখাল। 'ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স কি ঘাস খাচ্ছিল? গবেষণা সেলে একজন এজেন্টকে রোপণ করা কি এতই কঠিন ছিল?'

'না, চৌধুরীজি, কঠিন ছিল না।' আবার মাথার চুলে আঙুল চালাল খের। 'আমরা একজন না, দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম, বুঝলেন না! কিন্তু তারা দু'জনই খুন হয়ে গেছে...'

'কি বলছেন! কে তাদেরকে খুন করল?'

'আমরা তদন্ত করেছি, চৌধুরীজি। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বাংলাদেশী কেউ জড়িত নয়। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'না।' মাথা নাড়ল রানা।

'ওদেরকে খুন করেছে আইএসআই এজেন্টরা, বুঝলেন না!' দুম করে টেবিলে ঘুসি মারল খের। 'কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়েছে আমাদের!'

'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন, আমাদের গবেষণা সেলে আইএসআই অনেক আগে থেকেই ঢুকে বসে আছে?'

'হ্যাঁ, অন্তত আমাদের তাই ধারণা,' বলল খের। 'তা না হলে গত ছ'মাসে আমরা দু'জন এজেন্টকে হারালাম কিভাবে? দু'জনই ছিল বাঙালী মুসলমান, আমাদের স্লীপার এজেন্ট। প্রথমজন মারা যায় ছ'মাস আগে, দ্বিতীয়জন চারমাস পর, দু'জনই ল্যাব সহকারী হিসেবে ওই গবেষণা সেলে চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু আইএসআই ওদেরকে জয়েন করার সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। প্রথম জনকে ছিনতাইকারীরা রাস্তায় ছুরি মারে, আরেকজনের বাড়িতে ডাকাতি হয়, ফেরার সময় ডাকাতরা শুধু শুধু তাকে গুলি করে মেরে রেখে যায়। দুটোই আইএসআই-এর কাজ, আমরা জানি।'

রানা বলল, 'তাহলে তো বিপদের কথাই। যতই পাহারা

থাক, ভেতরে লোক থাকলে...'

'কেন, প্রফেসর হাসান ডিফেক্ট করছেন শোনার পর বাংলাদেশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা সেলটা সীল করে দেয়নি?' জানতে চাইল খের।

'তা দিয়েছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়,' বলল রানা। 'সীল করার নির্দেশ পাঠাতে পনেরো কি ষোলো ঘণ্টা দেরি করে ফেলে কর্তৃপক্ষ।'

টেবিলে এবার ঘুসি মারল হরভজন সিং। 'আইএসআই এজেন্টের জন্যে এই পনেরো ঘণ্টাই যথেষ্ট। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র ওরা বের করে নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু শুধু কাগজ-পত্র নিয়ে লাভ কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'প্রফেসর হাসানকে না পেলে পাকিস্তান ওগুলো কোন কাজে লাগাতে পারবে না।'

'আমি তো সেজন্যেই কর্তৃপক্ষকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছি, প্রফেসর হাসানকে এই মুহূর্তে সীমান্তের কাছ থেকে সরিয়ে আনা দরকার।' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে খের। 'বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীরের মত বিপজ্জনক জায়গা আর হয় না। পাকিস্তান যে-কোন মুহূর্তে প্রফেসরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে।'

'কিন্তু এত থাকতে প্রফেসর হাসান ওখানে কেন গেলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুনলাম রিয়াসি থেকে সীমান্ত নাকি খুব কাছে–মানে মাত্র ষাট-সত্তর মাইল দূরে।'

'বলছেন, ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শুনে লোভ সামলাতে পারেননি,' জবাব দিল সিং। 'এ-প্রসঙ্গ থাক, আপনি বরং প্রফেসরের স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কে কি জানেন বলুন।'

'ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি দেখা করেছি,' বলল রানা। 'মুখে স্বীকার না করলেও, ভাব দেখে মনে হলো তিনি স্বামীর সঙ্গে

মিলিত হতে চান। আপনারা কি ওদেরকে আনাবার ব্যবস্থা করছেন?'

এবার জবাব দিল খের, 'প্রফেসর স্ত্রী বা সন্তান সম্পর্কে একটা কথাও বলছেন না। তিনি না চাইলে আমরা শুধু শুধু উটকো ঝামেলায় কেন জড়াব, বলুন। ওদেরকে ভারতে আনা তো আর সহজ কাজ হবে না।'

'না, তা হবে না,' স্বীকার করল রানা।

হাতঘড়ি দেখল খের। 'আর দশ মিনিট পর আমাদের জম্মু ফ্লাইট, চৌধুরীজি। আপনার জন্যে আমরা রিয়াসির থ্রী স্টার হোটেল শালিমার ইন্টারন্যাশনালে একটা স্যুইট বুক করে রেখেছি, এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের একটা কার সরাসরি ওখানেই নিয়ে যাবে আপনাকে। আমি হয়তো নানা কাজে ব্যস্ত থাকব, তবে আমাদের অন্য কোন এজেন্ট প্রফেসরের সঙ্গে আপনার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবে...'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল রানা। 'তবে আমার ইচ্ছা ছিল লেডি সুরাইয়া'স ইনে ওঠার। প্রফেসর হাসান তো ওখানেই আছেন, তাই না?'

স্পীকারে ঘোষণা হচ্ছে—জম্মু ফ্লাইটের আরোহীরা যেন ডিপারচার লাউঞ্জে চলে যান।

'শালিমার ইন্টারন্যাশনাল ওই হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে, চৌধুরীজি,' রানাকে বলল খের। 'আসলে সিকিউরিটির কারণে লেডি সুরাইয়া'স ইনে বিদেশী কাউকেই আমরা উঠতে দিচ্ছি না। তবে আগে যদি জানতাম যে আপনিও ভারতে থেকে যেতে চাইবেন, তাহলে হয়তো একটা ব্যবস্থা করা যেত। ভাল কথা, চৌধুরীজি, প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি তাঁকে বোঝাবেন যে আপনাদের এখন আসলে কোন সেফ-হাউসে থাকা উচিত। উনি রাজি হলেই আপনাদেরকে আমরা দিল্লীতে সরিয়ে নেব।'

'এ প্রস্তাব এখনও তাঁকে আপনারা দেননি?'

'দিইনি আবার!' অসহায় দেখাল হরভজন সিংকে। 'কিন্তু রিয়াসি ছেড়ে এখুনি তিনি কোথাও যেতে রাজি হচ্ছেন না। বলছেন, প্রাকৃতিক সুধা হলো মনের টনিক, আবার কাজে ডুব দেয়ার আগে এই টনিক তাঁর একান্ত দরকার।'

'ঠিক আছে, আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করব।' .চেয়ার ছাড়ল রানা। 'এক্সকিউজ মি, আমি একটু টয়লেট থেকে ঘুরে আসি।'

টয়লেটে এসে কাগজটার ভাঁজ খুলল রানা। টানা হাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে-'প্রকৃত ঘটনা জানতে হলে হাজী ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানায় যেতে হবে আপনাকে। পথ দেখাবে সাদা রুমাল। কাগজটা পুড়িয়ে ফেলুন।'

ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কাগজটা কমোডে ফেলে ফ্লাশ করল রানা। ভাবছে, হরভজন সিং আসলে কে?

টেবিলে ফিরে এসে রানা দেখল হরভজন সিং চলে গেছে। রানাকে নিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে রওনা হলো হনুমানজি ওরফে অভিজিৎ খের।

ছয়

এয়ারপোর্টের বাইরে জম্মু একটা বিচিত্র শহর। সামরিক শাসনের অধীনেও বোধহয় এত কড়াকড়ি আরোপ করা হয় না। একই শহরে এলাকা বিশেষে কোথাও কারফিউ আছে, কোথাও নেই।

অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা এয়ারপোর্টে ঢুকবে, গোপনসূত্রে এরকম একটা খবর পেয়ে সামরিকবাহিনী এলাকায় কারফিউ জারি করেছে। প্লেনের আরোহীরা আসা-যাওয়া করছে সৈনিকদের প্রহরায় ভ্যানে চড়ে। সঙ্গে অভিজিৎ খের না থাকলে রিয়াসিতে রানা পৌঁছোতে পারত কিনা সন্দেহ, কারণ যে-সব বিদেশী শহরের বাইরে যেতে চায় তাদের একজনকেও এয়ারপোর্ট থেকে বেরুতে দিল না পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসাররা। এক মহল্লায় প্রশাসনিক ভবনে কাজ-কর্ম চলছে, বাজার খোলা, স্কুল-কলেজে ক্লাস চলছে; পাশের মহল্লায় সব বন্ধ, রাস্তায় ও গলিতে টহল দিচ্ছে সৈনিক, মোড়ে মোড়ে স্যান্ড-ব্যারিয়ার তৈরি করে জঙ্গিদের হামলা ঠেকানোর প্রস্তুতি, একই সঙ্গে চলছে ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশী। তিনবার রাস্তাবদল করতে বাধ্য হলো ওরা, পাঁচবার থামতে হলো রোড ব্লকে। দু'বার পরিচয়-পত্র দেখানো সত্ত্বেও সামরিক অফিসাররা অভিজিৎ খেরকে গুরুত্ব দিল না, গাড়ি থেকে নামিয়ে সার্চ করল দু'জনকেই। তবে রানার সুটকেস আর ব্রীফকেস সার্চ করে আপত্তিকর কিছুই তারা পেল না। পিস্তল, ছুরি, স্টীলেটো—সবই নিয়ে এসেছে রানা, সুটকেস আর ব্রীফকেসের ফলস বটমে বিশেষ মোড়কে মুড়ে লুকানো আছে।

পরবর্তী শহর উদামপুর। ওখানে পুরো শহরেই সকাল থেকে কারফিউ চলছে। জঙ্গিদের সঙ্গে যুদ্ধও চলছে ওই কারফিউয়ের মধ্যে। সামনের কোথায় কি অবস্থা জানার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হলো উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাক ও বাসের ড্রাইভাররা। তাদের পরামর্শে টয়োটার ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল খের। হাইওয়ে ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা ধরে রিয়াসিতে পৌঁছাল ওরা। রিয়াসি বেশ বড় শহর। দু'দিন আগে জঙ্গিদের হামলায় সাতজন সৈনিক মারা গেলেও, শহরের অবস্থা আজ একদম স্বাভাবিক। ভারতীয় সেনাবাহিনী বিনাবিচারে নিরীহ মুসলমানদের হত্যা করছে, পাকিস্তানের এই দাবি মোটেও সত্যি নয় বলে ঘোষণা

দিল খের। উদাহরণ হিসেবে রিয়াসিতে কাল ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিল। পাকিস্তানী ওই অনুপ্রবেশকারীদের রাজৌরী থেকে ধাওয়া করে রিয়াসিতে এনে কোণঠাসা করে ফেলে একদল ভারতীয় সৈনিক। যুদ্ধটা হয় একটা আবাসিক এলাকায়। পাকিস্তানী জঙ্গিরা সবাই মারা গেছে, সংখ্যায় তারা দশজনের কম নয়। দু'পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে নিরীহ প্রায় সতেরোজন মানুষ। যুদ্ধ শেষ হবার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের কিছুই বলেনি সৈনিকরা–না কাউকে গ্রেফতার করেছে, না কোন বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছে–অথচ এলাকার সবাই মুসলমান।

রিয়াসি এখন সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু শহরটাকে রীতিমত মিনি ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে রাখা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় সেনাবাহিনীর টহল তো আছেই, প্রধান সড়কের প্রতিটি মোড়ে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে, বহুতল ভবনের এমন কোন ছাদ নেই যেখানে মেশিন গান আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান বসানো হয়নি। শহরের বাসিন্দারা অবশ্য নির্বিকার, তারা তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ব্যস্ত। রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ি যানজট তৈরি করছে, রাস্তার পাশে ট্রাক থামিয়ে মালপত্র খালাসের কাজ চলছে। বাজার সরগরম, চেনাবে গিজগিজ করছে নৌকা আর লঞ্চের বহর।

সামরিক প্রস্তুতির দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল খের। তার চেহারায় গর্ব ও আত্মবিশ্বাস। 'কেমন বুঝছেন? এত পাহারার মধ্যে থেকেও পাকিস্তানীরা প্রফেসর হাসানকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

রানার মুখ শুকিয়ে গেল। 'তারমানে এত সব আয়োজন শুধু প্রফেসর হাসানের জন্যে?'

'অবশ্যই! গোটা ব্যাপারটাকে আমরা সিরিয়াসলি নিয়েছি, চৌধুরীজি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনারা যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন ওটা কেবল আমাদের কাছেই নিরাপদে থাকবে। পাকিস্তানীরা গো-মাংস খায়...সরি, আমি বলতে চাইছি ওরা জাতি

হিসেবে হিংস্র, ওই যন্ত্র পেলে নির্ঘাত ভারতে অ্যাটম বোমা ফাটাবে। এমনকি ওই মূল্যবান যন্ত্র বাংলাদেশের কাছে থাকাও নিরাপদ নয়। কারণ ওখানে থাকলে পাকিস্তানীরা ঠিকই কেড়ে নিয়ে যাবে, বুঝলেন না!'

রানার জন্যে আরও চমক অপেক্ষা করছিল। হোটেল শালিমারে ওর জন্যে রীতিমত সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। এটা সম্ভব হলো অভিজিৎ খের এয়ারপোর্ট থেকে ওদের বসকে টেলিফোনে সব কথা আগেই জানিয়ে দেয়ায়।

গোটা ব্যাপারটাকে নির্লজ্জ বেহায়াপনার চূড়ান্ত বলে মনে হলেও হোটেলের রুদ্ধদ্বার কনফারেন্স রূমে ছোটখাট অনুষ্ঠানটিতে হাসিমুখে উপস্থিত থাকতে হলো রানাকে, সম্বর্ধনা উপলক্ষে নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণও দিতে হলো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন স্থানীয় নেতা ও রাজ্য মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, শাহ আজিজ। প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বিজেপি মন্ত্রীসভার সদস্য চন্দ্রচূড় ভটভটিয়া। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী গোপালার সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল অভিজিৎ খের। জানা গেল, নেপথ্যে থাকলেও, কৃষ্ণস্বামী গোপালাই আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক।

কাশ্মীরী পোশাক পরা কয়েকজন কিশোরী মাল্যভূষিত করল রানাকে। দর্শকরা হাততালি দিল, তাদের প্রায় সবাই ইউনিফর্ম পরা সৈনিক ও সিভিল ড্রেসে ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। হোটেলের বোর্ডারদের আগেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে, কোন সাংবাদিককেও ঢুকতে দেয়া হয়নি ভেতরে। তবে ওয়েটারের ছদ্মবেশে স্থানীয় এক সংবাদদাতা ভেতরে ঢুকে গোপনে ছবি তুলতে চেষ্টা করায় সৈনিকরা তাকে মারধর করে ক্যামেরাটা কেড়ে নিল। এই ঘটনার পর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষণ বাতিল করা হলো। ভারতীয় সায়েন্স একাডেমির চেয়ারম্যান রাহুল সাকলায়েন দীর্ঘ একটা

মানপত্র পাঠ করলেন। মানপত্রটি লেখা হয়েছে প্রফেসর মইনুল হাসানকে উদ্দেশ্য করে, কিন্তু তিনি কোন সম্বর্ধনায় উপস্থিত থাকতে রাজি না হওয়ায় কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। আয়োজকরা এখন ভারতমাতার বিজয় উৎসব পালন করছে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে–প্রফেসর হাসানের সহকারীকে সম্বর্ধনা দিয়ে। রাহুল সাকলায়েন যা বললেন তার মর্মার্থ হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় ভাল ও অসাধারণ যা কিছু আছে তার সবগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতাদান ভারতের একান্ত কর্তব্য, এবং সেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার ভারতকেই নিশ্চিত করতে হবে।

এরপর বাদল চৌধুরীকে কিছু বলার অনুরোধ করা হলো। রানার ইচ্ছা ছিল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করবে, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে কি ভেবে যোগ করল, '...তবে আপনাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, আশীর্বাদ মনে করে ভারত যেন আবার অভিশাপকে আলিঙ্গন না করে।'

জরুরী আলাপ আছে বলে রানার স্যুইটে ঢুকতে চেয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী গোপালা, ক্লান্তির অজুহাত তুলে এড়িয়ে গেছে রানা। তবে তাগাদা দিতে ভুল করেনি, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রফেসর হাসানের সঙ্গে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করুন। তাঁকে আমার বোঝাতে হবে রিয়াসি আমাদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা। তাছাড়া, এখানে গবেষণার কাজ শুরু করতে হলে ঢাকা থেকে দরকারী কাগজপত্র কিভাবে আনানো যায় সে-বিষয়েও আলোচনা করা দরকার।'

উত্তরে গোপালা বলেছেন, 'আপনার ব্যাপারে এরইমধ্যে প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। আপনার নাম শুনে মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, দেশের কারও সঙ্গে তিনি দেখা করতে রাজি নন। তবে চিন্তার

কিছু নেই, আমরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করুন,' বলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে মাত্র, ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলল রানা। রুম সার্ভিস জানতে চাইছে ওর লাঞ্চ কি স্যুইটে পাঠিয়ে দেয়া হবে? ও জানাল, লাঞ্চ আগেই সেরেছে, তবে কফি চলবে।

শরীরের ওপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে, অথচ রানা কোন ক্লান্তি অনুভব করছে না। এর কারণ উত্তেজনা আর উদ্বেগ।

রুম সার্ভিস নক করতে দরজা খুলে দিল রানা। করিডরে দু'জন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে, দেখেও না দেখার ভান করল রানা।

রুম সার্ভিস চলে যেতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও, হাতে কফির কাপ। চওড়া রাস্তার ওপারেই প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে আড়াইশো বছর আগে সামন্ত রাজা শেখ সানাউল্লাহ তাঁর পত্নী সুরাইয়ার জন্যে এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন দরবার-ই-সুরাইয়া। পঙ্গু রাজা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া নতুন প্রাসাদে বসে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন, বিচার-আচার করবেন। কিন্তু উজির-নাজিরদের ষড়যন্ত্রে তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। এই প্রাসাদেই রাজা ও রানীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই থেকে বহুবার হাতবদল হয়েছে, কিন্তু কেউই বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অনাদায়ী খাজনা আদায় করতে সরকার প্রাসাদটিকে নিলামে তোলে। একটা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী গ্রুপ নিলামে কিনে সুরাইয়ার দরবারকে হোটেল বানিয়েছে, নাম দিয়েছে লেডি সুরাইয়া'স ইন। বিদেশী পর্যটকদের জন্যে এটা শুধু হোটেলই নয়, প্রাচীন ঐতিহ্য হিসেবেও অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

হোটেলের দু'পাশে বালির বস্তা দিয়ে কাভার তৈরি করা হয়েছে, ভেতরে মেশিন গানের পিছনে বসে আছে সৈনিকরা। রাস্তায় আর হোটেলের উঠানেও আছে তারা।

তিনতলা সুরম্য অট্টালিকা, কয়েক সারি গাছ চারদিক থেকে ঘিরে রাখায় সবগুলো জানালা এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা। ঢাকা থেকে জেনে এসেছে ও, দোতলার একটা স্যুইটে উঠেছেন প্রফেসর হাসান। সাতাশ নম্বর স্যুইট, রাস্তা থেকে নাকি দেখাও যায়। কিন্তু সাতাশ নম্বরের জানালা কোনটা, বোঝার কোন উপায় নেই।

আবার ফোন বাজল। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে সরে এল রানা। এবার ফোন করেছেন কৃষ্ণস্বামী গোপালা। হতাশ গলায় জানালেন, 'প্রফেসর হাসান বলছেন, আপনার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন কি করবেন না তা কাল দুপুর নাগাদ জানাবেন।'

'আপনারা তাঁকে বলছেন না যে রিঁয়াসিতে তাঁর একমুহূর্তও থাকা উচিত নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে তো আমরা এরইমধ্যে হাজার বার বলেছি। কিন্তু উনি বলছেন আরও অন্তত এক হপ্তা এখানেই সময়টা উপভোগ করবেন...'

'তিনি কি বাইরে বেরোন?'

'না। চাইলেও আমরা তাঁকে বেরুতে দেব না।'

'তাহলে ঘরের ভেতর বন্দী অবস্থায় সময়টা উপভোগ করছেন কিভাবে?'

'সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন,' বললেন গোপালা। 'আমরা কী হোল দিয়ে দেখেছি–সারাদিন শিখ দেহরক্ষীদের সঙ্গে দাবা খেলছেন উনি।'

'ওদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'নামকরা, পুরানো একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক ওরা। সবাই অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। প্রত্যেকের অতীত আমরা

চেক করে দেখেছি, সন্দেহ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি।'

'ঠিক আছে, উপায় যখন নেই কাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক। তবে, মি. গোপালা, আমি কিন্তু প্রফেসরের মত হোটেল রুমে বন্দী হয়ে থাকতে পারব না। আপনার লোকদের বলে দিন আমি বাইরে বেরুলে তারা যেন আমাকে অনুসরণ না করে, প্লীজ।'

'কিন্তু বাইরে বিপদ ঘটতে পারে, মি. চৌধুরী! প্রফেসরকে আমরা যেভাবে ঘেরাও করে রেখেছি, ওরা সুবিধে করতে পারবে না বলে হামলা করছে না। কিন্তু তাঁর বদলে আপনাকে পেলে অবশ্যই ওরা কিডন্যাপ করবে...'

'ওরা বলতে আপনি কাদেরকে বোঝাচ্ছেন?'

'অবশ্যই আইএসআইকে।'

'ওরা কি এত বোকা, এটুকু বোঝারও ক্ষমতা নেই যে প্রফেসরের প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলে এই গবেষণার কাজে এক পা এগোনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়? না, মি. গোপালা, আমাকে ওরা কিডন্যাপ করবে না। আমি বেরুচ্ছি, আপনার লোকদের বলুন...'

'না-না, প্লীজ, এখুনি বেরুবেন না,' তাড়াতাড়ি বললেন গোপালা। 'আমরা ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের বলে দিচ্ছি, ওরা আপনাকে বেরুতে বাধা দেবে না। কিন্তু আর্মিও তো পাহারা দিচ্ছে আপনাকে, ওদেরকে অফিশিয়ালি জানাতে একটু সময় লাগবে।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'সুরাইয়ার সামনে থেকে। কেন?'

খালি হাত দিয়ে ফোনের ক্রেডলটা ধরল রানা, জানালার সামনে এসে সোফার মাথায় নামিয়ে রাখল। 'রাস্তা পার হয়ে শালিমারে ঢুকে পড়ুন,' বলল ও, পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে বাইরে তাকাল। 'আপনি যদি আমাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরোন, আর্মির কেউ বাধা দেবে না।'

'আপনাকে আরেকবার ভেবে দেখতে বলি...,' শুরু করলেন ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

রানা তাঁকে হোটেলের উঠানে দেখতে পাচ্ছে, কানে মোবাইল ফোন নিয়ে পায়চারি করছেন। 'তাহলে সেই কথাই রইল,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

কান থেকে মোবাইল নামিয়ে সেটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন গোপালা। তবে রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল অভিজিৎ খের। সুরাইয়ার সামনে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, পরনে অ্যাশ কালারের নতুন একটা সুট। একই কালারের সুট পরা আরেক লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে। কথা বলার ফাঁকে দু'জনেই মাঝে মধ্যে মুখ তুলে রানার জানালার দিকে তাকাচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটার ব্রেস্ট পকেট থেকে ভাঁজ করা সাদা রুমালের ওপরের অংশটা বেরিয়ে থাকতে দেখল রানা।

হরভজন সিং যেই হোক, অভিজিতের এই মুহূর্তের সঙ্গী তার বন্ধু হতে পারে। কারণ কাগজটায় লেখা ছিল সাদা রুমাল পথ দেখাবে। এখন দেখতে হবে এই রুমাল সেই রুমাল কিনা।

কৃষ্ণস্বামী গোপালার সঙ্গে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে আশপাশে কোথাও রানা অভিজিৎ বা তার সঙ্গীকে দেখতে পেল না। গোপালা বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও, তাঁর কথায় কান না দিয়ে একটি রিকশা নিল রানা, চালককে বলল, 'বড় রাস্তা ধরে নদীর দিকে চলো, তোমাদের শহরটা আমি দেখতে চাই।'

তিন মিনিট পর রাস্তার পাশেই একটা বাজার দেখতে পেয়ে রিকশা ছেড়ে দিল রানা, গেট দিয়ে ঢুকে মিশে গেল লোকজনের ভিড়ে। তারপর আরেক গেট দিয়ে বেরিয়েই চেপে বসল দুই চাকার একটা টাঙ্গায়। নদীর ধারে প্রচুর লোকজন। ফেরিঅলাদের চিৎকারে কান পাতা দায়। টাঙ্গা থেকে নামল রানা, প্রৌঢ় কোচোয়ানকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, চাচা, বলতে পারেন—হাজী ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানাটা কোনদিকে?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথা নাড়ল প্রৌঢ়। 'ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানা? না তো, রিয়াসিতে এ নামের কোন মুসাফিরখানা আছে বলে তো শুনিনি।'

নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। চেনাব এখানে বেশ চওড়া। ছোটবড় নৌকা প্রচুর লোকজন নিয়ে এ-পার ও-পার আসা-যাওয়া করছে। কাছেই জেটি, লঞ্চ থেকে কার্গো খালাস হচ্ছে। একটু দূরে লঞ্চঘাট, বড় দুটো লঞ্চকে লোক তুলতে দেখা গেল। দু'জন ফেরিঅলা আর একজন দোকানদারকেও একই প্রশ্ন করল রানা। কিন্তু কেউ বলতে পারল না ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানা কোথায়।

নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ফাঁকা এলাকায় চলে এল রানা। একটু পরই বুঝতে পারল বিশ-বাইশ বছরের সুদর্শন এক ছোকরা পিছু নিয়েছে। পরনে ঢোলা সালোয়ার, ফুলহাতা শার্টের ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে লম্বা, সাদা রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছছে।

ফেরার জন্যে ঘুরল রানা, ছোকরাও ফিরতি পথ ধরল। এখন রানাই তাকে অনুসরণ করছে।

লঞ্চঘাটকে পাশ কাটিয়ে একশো গজ এগোতে সামনে পড়ল বাসস্ট্যান্ড। একহারা কাশ্মীরী তরুণ লাফ দিয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল। রানা বাসটার কাছে পৌঁছাবার আগেই জানালার ধারে একটা সীটে বসে মুখটা বাইরে বের করে দিল সে, রুমাল দিয়ে কপাল মুছল। ছোকরার চোখ দুটো রানার মনোযোগ কেড়ে নিল, এতই সুন্দর আর মায়াভরা। অবশ্য কাশ্মীরের প্রায় সবাই খুব সুন্দর দেখতে, বিশেষ করে তাদের চোখের কোন তুলনা হয় না।

বাসের হেলপার চিৎকার করছে, 'নওয়ানশাহর ছেড়ে গেল! নওয়ানশাহর ছেড়ে গেল!'

দাঁড়িয়ে পড়ছে রানা, বাসে উঠতে ইতস্তত করছে। রিয়াসি থেকে নওয়ানশাহর সড়ক পথে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। সন্ধ্যা

হতে এখনও ঘণ্টা তিনেক বাকি থাকলেও, যেতে-আসতেই বেশিরভাগ সময় বেরিয়ে যাবে। সন্ধ্যার পর ফেরার পথে যদি কারফিউ-এর মধ্যে পড়ে যায় তাহলেই বিপদ। আখনুর ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ডারঘেঁষা ছোট্ট শহর নওয়ানশাহর, তারপরেই পাকিস্তান; শহরের পরিস্থিতি শান্ত-স্বাভাবিক থাকার কোনই কারণ নেই। কিন্তু যতই ঝুঁকি থাক, যাবার পিছনেও যথেষ্ট জোরাল যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে ও। ওর হাতে একটাই মাত্র ক্লু, নাওয়ানশাহরে না গেলে সেটাকে এড়িয়ে থাকা হবে। হাতে সময় নিয়ে কাল সকালে গেলেও চলে, কিন্তু কাল ওকে হোটেল থেকে একা বেরুতে দেয়া হবে কিনা কে জানে।

ছোকরা জানালায় হাত রেখে, হাতের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, চেহারায় তেমন কোন ভাব না থাকলেও চোখ দুটো কেমন যেন কৌতূহলে চিকচিক করছে। মনে মনে স্বীকার করতে হলো, ছেলেটার চেহারায় নিষ্পাপ, সরল একটা ভাব ওকে আকর্ষণ করছে। কাঁধ ঝাঁকাল রানা, সিদ্ধান্ত নিল যাবে। হরভজন সিং চিরকুটে লিখেছে: 'প্রকৃত ঘটনা জানতে হলে হাজী ইউনুস মোল্লার সরাইখানায় যেতে হবে আপনাকে।' দেখা যাক প্রকৃত ঘটনা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে সে।

সাত

তিনটে রোডব্লক পেরুতেই সন্ধে হয়ে গেল, নাওয়ানশাহরে পৌঁছুল ওরা রাত আটটায়। রানার সঙ্গে শুধু ছোট একটা ছুরি,

কব্জির খানিক ওপরে ও উল্টোদিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো, শার্টের আস্তিন দিয়ে ঢাকা। শরীরের শুধু ওই জায়গাটা বাদে বাকি সব জায়গা হাতড়াল আর্মির লোকেরা, পাসপোর্ট দেখে জানতে চাইল নাওয়ানশাহরের কোথায় যাচ্ছে এবং কেন। ঢাকায় থাকতেই শুনেছে রানা, নওয়ানশাহর হলো স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য, তাই বলল, 'কিছু কেনাকাটা করব।'

আর কোন প্রশ্ন না করে পাসপোর্টটা ফেরত দিল গুর্খা রেজিমেন্টের ক্যাপটেন। রানা বসেছে সুদর্শন তরুণের পিছনের সীটে। দেখা গেল আর্মি অফিসাররা প্রায় সবাই তাকে চেনে, যদিও দেহ-তল্লাশীর সময় একবারও তাকে রেহাই দেয়া হলো না।

বাস থেকে নেমে একটা টাঙ্গা ভাড়া করল তরুণ। দেখাদেখি রানাও একজন সিংজীকে ডেকে তার টাঙ্গায় উঠে বসল। এদিকের টাঙ্গাঅলারা বেশিরভাগই শিখ। প্রতিটি রাস্তায় উপচে পড়া ভিড়। দোকানে দোকানে মাল-সামান ঠাসা। স্বাস্থ্য, হাসি আর পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় দেখেই বোঝা যায় এদিকটায় লোকজনের আর্থিক অবস্থা ভাল।

রাস্তাটা বেশ কিছুদূর চেনাবের পাশ দিয়ে চলে গেছে। নদী এখানে প্রায় এক মাইল চওড়া। এদিকটায় টহল দিচ্ছে কামান ও মেশিন গান বসানো ভারতীয় লঞ্চ, হুইলহাউজের মাথা থেকে অনবরত ঘুরছে সার্চলাইট। সন্ধে বলে পাকিস্তানের দিকটা ভাল দেখা না গেলেও দূরে ওদের টহল-লঞ্চের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। সার্চলাইটের সচল আলো দেখে বোঝা যায়, ওদের প্রতিরক্ষা-তৎপরতাও কম নয়। একটা লঞ্চঘাটকে পাশ কাটাল টাঙ্গা। সৈনিকদের তৎপরতা দেখে বোঝা গেল প্রতিটি লঞ্চে তল্লাশী চলছে। তবে সবাই খুব হাসিখুশি। সন্দেহ নেই, বাঁ হাতের কাজ ভালই চলে এখানে।

তারপর একটা বাঁক নিতেই রাস্তা নির্জন আর অন্ধকার হয়ে এল। এদিকেও লাইটপোস্ট আছে, তবে দূরে দূরে, তারওপর

সবগুলো জ্বলছে না। রানার গা ছমছম করতে লাগল। ঘোড়ার খুরের একঘেয়ে খটখট শব্দ ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করছে।

ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর বিশাল বৃক্ষশাখায় হরভজন সিং একটা পোকায় খাওয়া ফল, এটা ধরে নিয়েই সাদা রুমালকে অনুসরণ করছে রানা, মনে আশা কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। হরভজন সিঙের আসল পরিচয় যাই হোক, তার হাত যে খুব লম্বা তাতে কোন সন্দেহ নেই। দিল্লীতে বসে একটা নেট ওঅর্ক পরিচালনা করছে সে। অভিজিতের পাশে দাঁড়ানো সাদা রুমাল হোটেল থেকে বের করে এনেছে রানাকে, আরেকটা সাদা রুমাল রিয়াসি থেকে ওকে টেনে এনেছে স্মাগলারদের স্বর্গ নাওয়ানশাহরে। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের ভেতর ঢুকে পড়ে আইএসআই আলাদা একটা নেটওঅর্ক পরিচালনা করছে, এ সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাহলে হরভজন-রহস্যের ব্যাখ্যাটা কি? ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স সন্দেহ করছে বাদল চৌধুরী ভুয়া, ফাঁদে ফেলে জেনে নিতে চায় ওর আসল পরিচয় ও উদ্দেশ্য? না, তাও মেলে না। বাদল চৌধুরীকে পেয়ে ওদের উচ্ছ্বাস আর উৎসব অভিনয় হতে পারে না।

'হাজী ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানা আর কতদূর?' শিখ টাঙ্গাঅলাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপ মুসাফির হো জী?' লোকটা জানতে চাইছে রানা বিদেশী মেহমান কিনা। তারপর বলল, মোল্লার সরাইখানা আর মাইল দুয়েক দূরে।

নির্জন অন্ধকার এলাকাকে পিছনে ফেলে টাঙ্গা দুটো শহরের আরেক ব্যস্ত অংশে ঢুকে পড়ল। খোলা একটা বাজারের একপ্রান্তে মোল্লার সরাইখানা। টাঙ্গা থেকে নেমে ভাড়া মেটাল তরুণ, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে সরাইখানার ভেতর ঢুকে পড়ল। এক মিনিট পর তার পিছু নিয়ে রানাও। টাঙ্গাঅলাকে ভাড়া দেয়নি, ও না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছে।

প্রথমেই অফিস কামরা। কাউন্টারে বসে তসবিহ গুনছেন দরবেশের মত চেহারা নিয়ে হাজী ইউনুস মোল্লা, মাথার ওপর দেয়ালে ঝুলছে তাঁরই ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফটো। লম্বা সুরে আস্সালামোআলায়কুম বললেন, জবাব দিয়ে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। ভেতরে একটা প্যাসেজ, শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে তরুণ। প্যাসেজে ঢুকল রানা। শেষ মাথা থেকে তিন দিকে চলে গেছে প্যাসেজ। দু'পাশে সারি সারি দরজা; কোনটা খোলা, কোনটা বন্ধ। ভেতরে পেপার পড়ছে কেউ, কেউ রেডিও খুলে গান শুনছে। তেমাথায় এসে রানা দেখল ডান দিকের প্যাসেজ ধরে বিশ গজ এগিয়ে গেছে তরুণ, দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ একটা দরজার গায়ে হাত রেখে। তবে প্যাসেজে সে একা নয়।

লোক দু'জনকে দেখেই রানা চিনতে পারল: এরা জাত খুনী।

এই জ্ঞান রানা অর্জন করেছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে। জীবনে বহু খুনীকে দেখেছে ও, তাদের সঙ্গে লড়ে জিততেও হয়েছে, কাজেই দেখামাত্র ওদেরকে চিনতে ওর অসুবিধে হয় না।

প্যাসেজের দু'পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ডান দিকের লোকটার চেহারা-সুরৎ গণ্ডারের মত, গায়ের রঙ মেটে, গোল খুলি, চোখে শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি, মুখে মরা মানুষের অসাড় ভাব।

দ্বিতীয় লোকটা কালো ভালুক, বাকি সব হুবহু প্রথম লোকটার মতই।

দু'জনেই সালোয়ার কামিজের ওপর চাদর জড়িয়েছে।

রানার ষষ্ঠইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলেও, এত দূর এসে পিছু হটা গেল না। এখন ফিরে যেতে চাইলেও তা সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। লোক দু'জনকে পাশ কাটাচ্ছে রানা। বুক ফুলিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে ওরা, দু'জনের বুকেই রানার কাঁধের ঘষা লাগল। সুযোগটা রানা হাতছাড়া করেনি, হাত বুলিয়ে জেনে নিল চাদরের

আড়ালে কি আছে। ওর সুযোগ সন্ধানী আঙুল অটোমেটিক রাইফেলের আকৃতি চিনতে পারল। আরও আছে গ্রেনেড। পিস্তলও থাকতে পারে।

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে এতক্ষণে দরজায় নক করল তরুণ, তারপর আর দাঁড়াল না, রানার দিকে পিছন ফিরে প্যাসেজ ধরে সোজা হেঁটে হারিয়ে গেল বাঁকের মুখে।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভেতরে আলো বলতে শুধু একটা টেবিল ল্যাম্প। লম্বা গলার ল্যাম্পটা এমনভাবে রাখা, টেবিলের এদিকে দরজার দিকে পিঠ দেয়া একমাত্র খালি চেয়ারটায় শুধু আলো পড়েছে। টেবিলের উল্টোদিকে ঢোলা জোব্বা পরা এক লোক বসে আছে, কাঠামোটা টের পাওয়া গেলেও মুখ দেখা যাচ্ছে না। হরভজন সিং নয়তো? নাকি এক নম্বর সাদা রুমাল?

ভেতরে ঢুকে ডান দিকে তাকাল রানা। দরজা খুলে দিয়ে কবাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী আরেক লোক। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তাকেও খুনী বলে সন্দেহ করল রানা। এ লোকটা সম্ভবত জবাই করে মানুষ মারে, কোমরের বেল্টে আটকানো খাপের ভেতর মস্তবড় একটা ছোরা।

'আসুন, চেয়ারটায় বসুন,' হিন্দীতে বলল টেবিলের ওপাশে বসা লোকটা। 'আপনি কষ্ট করে আসায় সত্যি খুব খুশি হয়েছি।'

'হরভজন সিং?' চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে বসল রানা, ফলে ওর পিঠ এখন দরজার দিকে থাকছে না।

'কোন নাম উচ্চারণ করবেন না, প্লীজ,' এবার ইংরেজিতে বলল লোকটা। মার্জিত কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণ। নেটওয়র্কটা আইএসআই-এর হলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সে যোগ্য লোকজনকেই রোপণ করেছে তারা।

'আমার হাতে সময় কম,' বলল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে এখানে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।'

'প্রকৃত ঘটনা হলো, ওরা আপনাকে মিথ্যে কথা বলছে,' বলল

লোকটা। 'প্রফেসর মইনুল হাসান রিয়াসিতে নেই। এমন কি কাশ্মীর বা ভারতেও নেই।'

'তাই নাকি?' রানা একটা ধাক্কা খেলেও ঠিক বুঝতে পারছে না লোকটার কথা বিশ্বাস করবে কিনা। 'তাহলে তিনি কোথায়? এ-জগতে আছেন তো? আর ওরা আমাকে মিথ্যে কথাই বা বলছে কেন?'

'মিথ্যে কথা বলছে না, ধারনার কথা বলছে। ওদের বিশ্বাস প্রফেসর হাসানকে কাশ্মীরেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তল্লাশী চালিয়ে বের করে আনবে। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়, কারণ সিআইএ এজেন্টরা প্রফেসর হাসানকে নিয়ে চলে গেছে।'

আমেরিকা সিআইএ-কে দিয়ে এ-কাজ করাতে পারে, ভাবল রানা। 'কোথায়?'

'এই মুহূর্তে ব্যাংককের একটা সেফহাউসে রাখা হয়েছে প্রফেসরকে, সুযোগমত আমেরিকায় পাচার করা হবে।'

'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, তার প্রমাণ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাছাড়া, এত কড়া পাহারার মধ্যে দু'একজন সিআইএ এজেন্ট প্রফেসরকে কাশ্মীর থেকে বের করল কিভাবে?'

'কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা নেই, তাই এ-কথা বলছেন,' জবাব দিল লোকটা। 'রিয়াসি আর নাওয়ানশাহরের কথাই ধরুন, সব মিলিয়ে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা কত হবে এখানে? খুব বেশি হলে সাত হাজার। কিন্তু এই দুই শহরের লোকসংখ্যা চার লাখ, বেশিরভাগই মুসলমান, অন্তত পঞ্চাশ হাজারই অস্ত্র চালাতে জানে এবং স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সাহায্য করে। আরও আছে আইএসআই এজেন্টরা, জঙ্গি পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা। কি দাঁড়াল?'

'এ-সবের সঙ্গে সিআইএ-র কি সম্পর্ক?'

'এবার একটা যোগ অঙ্ক মেলান, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন,' হেসে উঠে বলল লোকটা। 'পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বসে

গেছে, ওদেরকে প্রায় দেউলিয়াই বলা যায়। আমেরিকান ডলার ওদের খুবই দরকার। সেই ডলার যদি সিআইএ পাইয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে, বিনিময়ে আইএসআই সিআইএকে সাহায্য করবে না?'

রানা চিন্তা করছে।

'সুরাইয়া'স ইনে গোপন টানেল আছে, মি. চৌধুরী,' আবার বলল লোকটা। 'প্রফেসরকে বের করে নিয়ে যেতে আইএসআই-এর কোন সমস্যাই হয়নি। চেনাব পার করে শিয়ালকোটে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে, ওখানে সিআইএ-র একটা ছোট প্লেন অপেক্ষা করছিল।'

এত সাজিয়ে মিথ্যে বলা সহজ নয়, লোকটার কথা এখন রানা প্রায় সবটাই বিশ্বাস করছে। 'বেশ, প্রফেসর এখন ব্যাংককে। কিন্তু আপনাদের পরিচয়? আমাকে উপযাচক হয়ে প্রকৃত ঘটনা জানাবার পিছনে কি উদ্দেশ্য?'

'আমাদের পরিচয় আপনি যা জানেন, তাই,' বলল লোকটা। 'আমরা আইসিআই–ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। তবে আপনার কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই, আমরা কয়েকজন সিআইএকে সাহায্য করছি, সেই সূত্রে আইএসআইকেও।'

নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, এরকম ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি করার পর ওরা কি ওকে ফিরে যেতে দেবে? শরীর ঘামতে শুরু করল। 'উদ্দেশ্য?'

'সিআইএ-র প্রস্তাবটা আপনাকে জানানো,' বলল লোকটা। 'আপনি প্রফেসরের সঙ্গে কাজ করতে চান, সিআইএ-র কানে এ-কথা পৌঁছে গেছে। তারা চাইছে আমরা আপনাকে আইএসআই-এর হাতে তুলে দিই, তারা আপনাকে পাকিস্তান হয়ে ব্যাংককে পৌঁছে দেবে।'

মাথা নিচু করল রানা, যেন প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখছে। তারপর মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমি যদি আমেরিকায়

যেতে না চাই?'

'যাওয়াটাই আপনার জন্যে মঙ্গল হবে,' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বলল লোকটা।

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।'

'তাহলে আরও পরিষ্কার করে বলি।' অন্ধকারে নড়েচড়ে বসল লোকটা, চেয়ারটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করল। 'বাইরে সিআইএ অপেক্ষা করছে। এখান থেকে বেরুলেই আপনাকে ধরবে তারা। ধরে কি করবে...কল্পনা করে নিন।'

'এখানে সিআইএ আসবে কোত্থেকে?' বলল রানা। 'বলুন আপনাদের লোকই ধরবে আমাকে।'

'জানেনই যখন, জিজ্ঞেস করছেন কেন! হ্যাঁ, নিজ স্বার্থেই আমরা এখন আপনাকে রিয়াসিতে ফিরতে দিতে পারি না। অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন আপনি।'

'আমি যদি কথা দিই যে কাউকে কিছু বলব না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুঃখিত, মি. চৌধুরী,' জবাব দিল লোকটা। 'আপনাকে বিশ্বাস করার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

রানা হাসল। 'কিন্তু কেন ভাবছেন বাইরে শুধু আপনাদের লোক অপেক্ষা করছে? কৃষ্ণস্বামী গোপালা জানেন আমি হাজী ইউনুস মোল্লার সরাইখানায় আসছি।'

লোকটা হেসে উঠে টেবিলের আলোকিত অংশে একটা ওয়াকি-টকি রাখল। 'আপনাকে কেউ ফলো করেনি, মি. চৌধুরী। করলে আমি খবর পেতাম।'

'আপনি যতই ভয় দেখান, যতই ঝুঁকি থাক, আমি এখন ফিরে যাব,' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা।

'ব্যাপারটা আপনাকে আরেকবার বিবেচনা করে দেখতে বলি,' টেবিলের ওদিক থেকে শান্ত গলায় বলল লোকটা। 'আপনি প্রফেসর হাসানের সঙ্গে যে-কোন জায়গায় কাজ করতে প্রস্তুত.

এটা জানার পরই এখানে আপনাকে আসতে সাহায্য করেছি আমরা। আশা করি আপনি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে এই সরাইখানা সাধারণ কোন জায়গা নয়। আপনাকে চলে যেতে দিলে কত বড় ঝুঁকি নিতে হয়, একটিবার ভেবে দেখবেন না?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'এই জায়গার গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য আমার চোখে ধরা পড়েনি।'

'আপনাকে তো বললামই, আইএসআইকে সাহায্য করছি আমরা,' বলল অন্ধকারের বাসিন্দা। 'আর আইএসআই সাহায্য করছে কাশ্মীরী গেরিলাদের। আপনি এই মুহূর্তে ওই স্বাধীনতাকামীদের একটা গোপন আস্তানায় বসে আছেন।'

ব্যাপারটা রানাকে দ্বিধায় ফেলে দিল। জবাব দেয়ার আগে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করল কয়েক মুহূর্ত। 'দেখুন, আপনারা ভারতীয় হয়ে, শুধু তাই নয়, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসার হয়ে, পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সকে এবং কাশ্মীরী গেরিলাদেরকে সাহায্য করছেন, দেয়ালের ওই টিকটিকিটাও তা বিশ্বাস করবে না। তবে এ-প্রসঙ্গ থাক। কাশ্মীরের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা যদি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, কাশ্মীরীদের এই সংগ্রামকে নৈতিকভাবে সমর্থন করি আমি। কথা দিচ্ছি, গেরিলাদের এই আস্তানার কথা কাউকে আমি বলব না।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করলাম,' বলল লোকটা। 'কিন্তু আপনি তো জানেনেই, আরও অনেক ব্যাপার আছে। আপনাকে সত্যি আমরা যেতে দিতে পারি না।'

রানা বলল, 'অথচ আমি যাবই।'

'আরেকটু বসুন, প্লীজ।' নড়াচড়া করায় লোকটার চেয়ার আবার ক্যাঁচক্যাঁচ করল। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করি।'

'আমি শুনছি।' রানা বসল না, একটা চোখ খোলা দরজার দিকে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তবে প্যাসেজে ছায়ার নড়াচড়া

টের পাওয়া যাচ্ছে।

'আপনি তো প্রফেসরের সঙ্গে ভারতে থেকে যেতে রাজি হয়েছিলেন, এখন তাহলে আমেরিকায় থাকতে আপত্তি করছেন কেন?'

'আপত্তি করছি এইজন্যে যে এর সঙ্গে আমেরিকা বা সিআইএ জড়িত বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' সত্যি কথাই বলল রানা, কারণ জানে এখান থেকে বেরুলে মৃত্যুর মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতেই হবে। 'আমাকে আসলে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে কাজ করতে বলা হবে।'

'তারমানে আপনি আমার একটা কথাও বিশ্বাস করেননি?' লোকটার গলায় হতাশা।

রানা চুপ করে থাকল। সেজন্যেই হঠাৎ করে দম আটকানোর শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল ও। ঝট করে বসে পড়ছে, ভোলেনি দরজার পাশে দাঁড়ানো কসাইটার কাছে পিস্তল ছাড়াও ছোরা আছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল প্যাসেজ থেকে ভেতরে ঢুকছে গণ্ডার আর ভালুক। স্মৃতি সাহায্য করাতেই ছোরাটা রানার শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ঢুকল না। ঝট করে বসেই আবার বিদ্যুৎবেগে সিধে হয়েছে ও, কসাইয়ের পেটে মাথার শক্ত গুঁতো লাগতে ডিগবাজি খেলো সে, রানার খালি করা চেয়ার নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, ছোরাটা আগেই ল্যাম্পের পাশে কাঠের ভেতর গেঁথে গেছে।

হ্যাঁচকা টানে ওটা টেবিল থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল কসাই, হাতের কিনারা দিয়ে তার উন্মুক্ত ঘাড়ে একটা কোপ মেরে পিছিয়ে এল রানা, বেল্টে গোঁজা পিস্তলটা টান দিয়ে বের করে নিয়েছে। কানে ঢুকল বাঘের হুঙ্কার।

'ইউ বাস্টার্ড!' রানার ইন্টারোগেটর টেবিলের ওদিকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'সালে বুড়বাক কাঁহিকে! বলেছি না, এখানে নয়!'

ঘাড়ে কোপ লাগায় কসাইয়ের মাথা বাড়ি খেলো টেবিলে, টেবিল ল্যাম্পটা ঘুরে যাচ্ছে। ঘরের অন্ধকার দিকটা অকস্মাৎ আলোকিত হয়ে উঠতে একই সঙ্গে দুটো জিনিস লক্ষ করল রানা–জোব্বা পরা লোকটা, যে এতক্ষণ কথা বলছিল ওর সঙ্গে, সে আসলে প্রথম সাদা রুমাল, রানা তাকে হোটেলের জানালা দিয়ে অভিজিৎ খেরের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে; লোকটার পিছনে একটা জানালা, সেই জানালার পর্দা সরিয়ে ওদেরকে এতক্ষণ দেখছিল কেউ, টেবিল ল্যাম্পের আলো পড়তেই সরে গেল।

'হুঁশিয়ার!' আবার গর্জে উঠল সাদা রুমাল। তার অবশ্য কোন দরকার ছিল না, রানার হাতে পিস্তল দেখে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছে গণ্ডার আর ভালুক। 'ঠিক আছে, তোমরা রওনা হয়ে যাও,' ওদেরকে বলল সে। 'কিসের সামনে পড়তে হবে বুঝতেই তো পারছ। কোন অবস্থাতেই যেন এই লোক রিয়াসি ফিরতে না পারে!' দু'জনেই তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে আসছে, নড়াচড়া করায় কসাইয়ের ভারী শরীরটা খসে পড়ছে টেবিল থেকে। শেষ মুহূর্তে পতনটা ঠেকাল সে, সিধে হয়ে টলছে, বেল্টে হাত চাপড়ে দেখছে পিস্তলটা ওখানে আছে কিনা। সাদা রুমালের ধমক খেয়ে পিছিয়ে গেল সে, দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

'আপনার সঙ্গে আর কোন কথা নেই আমার,' আইসিআই-এর পোকায় খাওয়া নষ্ট ফল বলল রানাকে। 'যান, পরখ করে দেখুন, ওই পিস্তল আপনাকে বাঁচাতে পারে কিনা।'

পিছু হটে চৌকাঠের ওপর থামল রানা। 'স্রেফ কৌতূহল–ঘটনাটা এখানে কেন ঘটছে না?'

'হাজী ইউনুস মোল্লাকে কথা দেয়া আছে, তাঁর মুসাফিরখানায় এক ফোঁটা রক্তও ফেলা যাবে না।'

ফাঁকা প্যাসেজে বেরিয়ে এসে দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ

দিয়ে দাঁড়াল রানা। পিস্তলটা চেক করে দেখল চেম্বারে সাতটা বুলেট রয়েছে।

অফিস কামরায় ইউনুস মোল্লাকে আগের মতই দুলে দুলে তসবিহ গুনতে দেখা গেল, তবে এবার তাঁর চোখ দুটো বন্ধ; দ্বিতীয় সাদা রুমাল অর্থাৎ সেই তরুণটি ফিসফিস করে কি যেন মন্ত্র দিচ্ছে তাঁর কানে।

নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এসে রানা দেখল টাঙ্গাঅলা এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ওর অপেক্ষায়, ঘোড়ার গায়ে একটা হাত রেখে বিড়ি খাচ্ছিল, সেটা নিভিয়ে রেখে দিল জোব্বার পকেটে। ওকে দেখে পাগড়িটা ঠিকঠাক করল।

মুসাফিরখানার সামনেটা নির্জন হলেও, কাছেই খোলা বাজার থাকায় রানার মনে যে প্ল্যানটা উঁকি দিচ্ছে তা কাজে লাগাতে হলে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

'একটা বিড়ি হবে নাকি?' টাঙ্গাঅলাকে জিজ্ঞেস করল ও। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল কোথাও একটা ভেসপা স্টার্ট নিল।

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রানার জুতো আর সুট দেখছে, তারপর ব্যস্ত ভঙ্গিতে জোব্বার পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

বিড়ি ধরিয়ে দেশলাইটা ফেরত দিল রানা, লক্ষ করল লোকটা ভুলেও ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। মনে মনে হাসল ও। 'ঠিক আছে, চলো,' বলে টাঙ্গায় উঠতে যাবে, এই সময় মুসাফিরখানা থেকে বেরিয়ে এসে সেই সুদর্শন তরুণ ডাকল, 'মুসাফির?' মৃদু গলা।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ায় রানাই এগিয়ে এল। 'কিছু বলবে?'

'স্যার,' ফিসফিস করল ছেলেটা, 'মোল্লা চাচা আপনাকে ডাকছেন।'

'কেন?'

'আপনি মুসলমান তো, তারওপর একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের যুদ্ধও সমর্থন করেন। তাই চাচা বলছেন একবার শুধু

আল্লাহর কসম খেলেই হবে, উনি বিশ্বাস করবেন মুসাফিরখানার কথা কাউকে আপনি বলবেন না। তারপর রাতটুকু এখানেই কাটাতে পারবেন। কাল সকালে আপনাকে উনি রিয়াসিতে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

'এ-সব তিনি জানলেন কিভাবে?'

ছেলেটা মাথা নিচু করল। 'আমি বলেছি। আপনাদের সব কথা বাইরে থেকে শুনলাম তো।'

'আমার প্রতি তোমার এই দরদ, কারণটা কি?'

ছেলেটা চুপ করে থাকল।

'আমাকে এভাবে সাহায্য করলে তোমাদের অসুবিধে হবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।'

'কেন অসুবিধে হবে না?'

'ওরা পাকিস্তানী জঙ্গি, স্যার। আমরা ঠাঁই দিই বলেই ওরা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। ওদের সাহায্য নিয়ে ভারতীয় আর্মির বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি ঠিকই, কিন্তু ওদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ এক নয়। আমরা চাই কাশ্মীরের স্বাধীনতা, আর ওরা চায় এটাকে পাকিস্তান বানাতে।'

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শাহিন।'

'শাহিন, মোল্লা চাচাকে আমার সালাম আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলবে, নিজেকে আমি রক্ষা করতে পারব। তুমিও আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবে না, কেমন?'

শাহিন শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'আপনি একা ওদের সঙ্গে লড়বেন?'

'হয়তো লড়ব না, ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাব,' বলল রানা।

হঠাৎ মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'ওরা আপনাকে চিনতে পারেনি; কিন্তু আমি প্রথম থেকেই জানি আপনি পিছু হটার লোক নন।

যাবেনই যখন, যান—আমার দোয়া রইল!' ঘুরেই ছুটল সে, যেন কথাটা বলে ফেলে সাংঘাতিক লজ্জা পেয়েছে।

খোলা বাজার ছাড়িয়ে এসে নির্জন রাস্তায় পড়ল টাঙ্গা। তারপর যেই বাঁক নিতে যাবে অমনি টাঙ্গাঅলার কাঁধে টোকা দিল রানা। 'থামো!' লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ও, হাতের পিস্তল তাক করল লোকটার মাথায়। 'ওদিকে যাচ্ছ কেন? আসার সময় তো সোজা এসেছিলে।'

লোকটা আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে, ওদিকে রোড ব্লক থাকতে পারে ভেবে...' এখনও সে রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

'ওদের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে, তাই না? বলে দিয়েছে কোন রাস্তা দিয়ে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে?'

'না! কই! কাদের কথা বলছেন?'

'সীট থেকে নামো,' কঠিন সুরে বলল রানা। সীট থেকে নেমে কাঁপতে লাগল লোকটা। 'এবার বলো, হামলাটা কোথায় হবে?'

অন্ধকার রাস্তার দিকে হাত তুলল লোকটা। 'আরও দুটো বাঁক ঘোরার পর, হুজুর। আমি পেশাব করার জন্যে টাঙ্গা থামাব, ওরা সামনে আর পিছন থেকে একজন করে আসবে, বাকি দু'জন থাকবে রিজার্ভ, পরের বাঁকে...'

'ঠিক আছে, তুমি এখন পালাও। কাল সকালে বাসস্ট্যান্ড থেকে টাঙ্গা নিয়ে যেয়ো। যাও!' লোকটা চমকে উঠল ঠিকই, কিন্তু সেটা তার ভান।

ঘুরতে যাচ্ছে, এরকম একটা ভঙ্গি করল লোকটা, পরমুহূর্তে জোব্বার ভেতর থেকে আধ হাত লম্বা, ধারাল একটা ছোরা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। এরকম কিছু আশা করেনি রানা, ফলে সরে যাবার প্রস্তুতি ছিল না। ওর প্ল্যান ছিল লোকটা ঘুরলেই তার মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারবে। আত্মরক্ষার

সহজাত প্রবৃত্তি আর রিফ্লেক্স অ্যাকশন বাঁচিয়ে দিল ওকে, আজ রাতে এরই মধ্যে দ্বিতীয়বার। শরীর পিছনদিকে বাঁকা করে ছোরার ফলাটা এড়াল রানা, বাঁ হাতের মুঠোয় খপ করে লোকটার কব্জি ধরে মোচড় দিল। ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল গুরু নানকের শাগরেদ, খুলিতে পিস্তলের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাল।

আট

ঢালের মাথার কাছে রাস্তায় আলো আছে, সিকি মাইল দূর থেকে টাঙ্গাটাকে সেখানে দেখতে পেল গণ্ডার আর ভালুক। ওরা দাঁড়িয়ে আছে খাদের কিনারায়, সমতল রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বোল্ডারের আড়ালে। দু'জন দু'জায়গায় দাঁড়িয়েছে, মাঝখানে একটা লাইটপোস্ট। টাঙ্গাঅলাকে বলা আছে, ঠিক লাইটপোস্টের সামনে থামবে সে।

ঢালু রাস্তা ধরে দ্রুত ছুটে আসছে ঘোড়ার গাড়ি। সমতল রাস্তায় নামার পর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল গতি। দূর থেকে গদিতে হেলান দিয়ে বসা আরোহীকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও, তার পরনের হালকা বাদামী সুট ওরা চিনতে পারল।

ঠিক লাইটপোস্টের নিচে থামল টাঙ্গা। গদিতে হেলান দিয়ে বসা আরোহীকে কি যেন বলল টাঙ্গাঅলা, তারপর আসন থেকে নেমে সোজা পিছন দিকে হাঁটা দিল।

তাকে আসতে দেখে বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা গণ্ডার বিড়বিড় করল, 'উও সালা গাণ্ডু ইধার কিঁয়ু আতা!'

'সাহাব,' সামনে এসে টাঙ্গাঅলা অর্থাৎ কোচোয়ান অভিযোগের সুরে ফিসফিস করল, 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন, ফিরতে দেরি হলে টাঙ্গার মালিক মা-বাপ তুলে গাল দেবে আমাকে।'

'এখানে দাঁড়াও তুমি,' বলে টাঙ্গাঅলাকে পাশ কাটাল গণ্ডার, পরমুহূর্তে পিঠে শক্ত কিছু ঠেকতে জমে পাথর হয়ে গেল। 'নড়েছ কি শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দেব,' পিছন থেকে হিসহিস করল রানা, হাত বাড়িয়ে গণ্ডারের বেল্ট থেকে তুলে নিল ওর পিস্তলটা। সেটা পকেটে রেখে সার্চ করল দ্রুত। ব্যারেল কাটা একটা শটগান ছাড়াও কোমরে গোঁজা ঝুলন্ত পাউচে পাওয়া গেল একজোড়া গ্রেনেড আর খাপে ভরা একটা ছোরা। মানিব্যাগ আর চাবির রিঙটাও পকেটস্থ করল রানা। 'সোজা হাঁটবে, থামবে টাঙ্গার পিছনে। আমি তোমার পেছনেই আছি, দৌড় বা চিৎকার দিলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। হাঁটো!'

গণ্ডারের পিছু নিয়ে বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ভালুকটা টাঙ্গার সামনে কোথাও লুকিয়ে আছে, এদিকে এরা দু'জন কি করছে না করছে দেখতে পাবার কথা নয়। টাঙ্গার পিছন থেকে গণ্ডার যখন তিন-চার হাত দূরে, শটগান আকাশের দিকে তাক করে পর পর দুটো গুলি করল রানা। তারপর পিছন থেকে গণ্ডারের কানে ফিসফিস করল, 'টাঙ্গার সামনে চলে যাও, ঘোড়ার পাশ থেকে তোমার সঙ্গীকে জানাও কাজ শেষ।'

টাঙ্গার পাশে এসে গণ্ডার শব্দ করে হেসে উঠল। রানা যতটুকু চেয়েছে, এই অভিনয় তার অতিরিক্ত। হাসতে হাসতেই ডাক দিল সঙ্গীকে, 'সালামত খান, নিকাল আও! সালে খতম হো গিয়া!'

'সালা ডরপোক বোঙ্গালী মর গিয়া? অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট! নো ডিফেন্স, নো অফেন্স, নাথিং?' হো হো করে হেসে উঠল ভালুক ওরফে সালামত খান, বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে টাঙ্গার দিকে হেঁটে আসছে। 'একটা বেশ্যা

যোগাড় করো, দোস্ত! চেনাবে আজ দুলে দুলে ফুর্তি করি।'

ফিসফিস করল রানা, 'যাও, বন্ধুকে আলিঙ্গন করো!' শটগানের ব্যারেল দিয়ে খোঁচা মারল পিঠে।

দুই বাহু মেলে দিল গণ্ডার, তার ভেতর সেঁধিয়ে গেল ভালুক। পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে ওরা।

ভালুকের পিছনে চলে এল রানা, শটগানের মাজল ঠেকাল তার কানের পাশে। 'হাতের কারবাইনটা ফেলে দাও।'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ভালুক। তারপর পেশিতে টান পড়ল, মনে হলো কিছু একটা করতে যাচ্ছে। কিন্তু না, আবার ঢিল দিল পেশিতে। আঙুল আলগা করায় খসে পড়ল কারবাইন।

'কোমর থেকে পিস্তলটা বের করো, উল্টো করে ধরবে,' বলল রানা। 'সাবধান, কোন রকম চালাকি না।'

কোমরে গোঁজা পিস্তলটাও পায়ের কাছে ফেলে দিল ভালুক। ইতিমধ্যে সঙ্গীকে ছেড়ে এক পা পিছিয়ে এসেছে সে।

পায়ের ধাক্কায় কারবাইন আর পিস্তল নাগালের বাইরে সরিয়ে দিল রানা। 'আর কোথায় কি আছে বের করো সব!'

'তুম গাদ্দারী কিয়া!' বলেই খাপ থেকে বের করা ছোরাটা ঘ্যাচ্ করে গণ্ডারের পেটে ঢুকিয়ে উপরে টান দিল ভালুক। আধ সেকেন্ড পর ভালুকের খুলিটা উড়িয়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা।

রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল গণ্ডার, দু'হাতে ধরে টেনে বের করল ছোরাটা। তারপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। দু'তিনবার ঝাঁকি খেলো ভালুকের পা, তারপর স্থির হয়ে যেতে দেখল রানা। মুখ তুলে রাস্তার দু'দিকে তাকাল ও। কেউ নেই, কেউ আসছেও না।

টাঙ্গা থেকে অজ্ঞান কোচোয়ানকে নামাল রানা। কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে এল বোল্ডারের আড়ালে। আবার তাকে বিবস্ত্র করতে হলো। ট্রাউজার, শার্ট, কোট, টাই আর জুতো খুলে নিয়ে চলে এল টাঙ্গার পাশে, ওগুলো লুকিয়ে রাখল গদির নিচে।

সামনে চড়াই, ধীরগতিতে উঠছে ঘোড়া, ফোঁস ফোঁস জোর নিঃশ্বাস ফেলছে।

তারপর আবার উৎরাই। টগবগিয়ে ছুটল ঘোড়া। ঢালের নিচে সমতল রাস্তা। ওখানেই পরবর্তী বাঁক।

কসাইকে নিয়ে বাঁকটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে নষ্ট ফল অর্থাৎ হরভজন সিং-এর প্রথম সাদা রুমাল। রানা মুসাফিরখানা থেকে বেরুবার পর সে-ও পোশাক পাল্টে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে, তারপর ভেসপায় চড়ে চলে এসেছে এখানে। প্ল্যানটা আগেই ঠিক করা ছিল। বাদল চৌধুরী প্রস্তাব না মানলে বিনা বাধায় মুসাফিরখানা থেকে বেরুতে দেয়া হবে তাকে। বেরিয়ে দেখবে একটাই মাত্র টাঙ্গা। বাধ্য হয়ে ওটাতেই উঠতে হবে তাকে। টাঙ্গাঅলা ওদের লোক, সে জানে কোন পথ ধরে আরোহীকে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে।

প্ল্যানটা অবশ্য একটু বদলাতে হয়েছে। বাদল চৌধুরী নিজের টাঙ্গা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, ফলে নিজেদের টাঙ্গা বিদায় করে দিয়েছে ওরা। তবে এ লোকটাও ওদের পরিচিত, প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

•এই বাঁকে পজিশন নেয়ার আগে সামনের বাঁক থেকে একবার ঘুরে এসেছে নষ্ট ফল, গণ্ডার আর ভালুককে বলে এসেছে কাজ শেষ হওয়া মাত্র রিপোর্ট করতে হবে তাকে।

কাজটা ওরা সুষ্ঠুভাবে করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে তার। শটগানের একটা গুলিই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুইবারে তিনটে গুলির আওয়াজ শুনেছে সে।

ঢালের মাথায় একটা টাঙ্গা দেখা গেল। সন্ধ্যার পর এদিকে গাড়ি বা লোকজন কিছুই আসা-যাওয়া করে না: এটা ওদের সেই পরিচিত টাঙ্গাই হবে।

টাঙ্গা কাছাকাছি আসার পর তার মেজাজ গরম হয়ে উঠল

ওদের না তাকে রিপোর্ট করার কথা? তাহলে টাঙ্গা খালি কেন?

ভেসপাটা পাথরের আড়ালে লুকানো আছে। সঙ্গী কসাইকে সেখানেই থাকার ইঙ্গিত দিয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এল সে, খালি হাতটা তুলে বলল, 'রোকো! রোকো!'

লাগামে টান দিল রানা, টাঙ্গা দাঁড়িয়ে পড়ল। এগিয়ে এসে টাঙ্গার ভেতরটা ভাল করে দেখল নষ্ট ফল। 'ওরা কোথায়?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল সে।

শিখ টাঙ্গাঅলার গলা নকল করে পাঞ্জাবী ভাষায় রানা বলল, 'ওরা তো এল না, সাহেব।'

'এল না মানে? কাজটা হয়নি?'

'কাজ হয়েছে, সাহেব। সেই আনন্দেই তো এল না।'

'সেই আনন্দে এল না! মানে?'

এক হাতে পাগড়িটা সামলাল রানা। 'কাজ ভালভাবে শেষ হওয়ায় ওরা বলল, আজ রাতে চেনাবে ফুর্তি করবে।'

'হোয়াট!' চাপা গলায় গর্জে উঠল সাদা রুমাল। 'এপারে এত কড়াকড়ির মধ্যে আজ রাতে ওরা কোন সাহসে ওপার যাচ্ছে! তাছাড়া, বানচোতরা জানে না চেনাবে করে কি নিয়ে আসা হয়েছে!'

চুপ করে আছে রানা। চেনাব নদী হলেও, নষ্ট ফল চেনাব বলতে নদীকে বোঝাচ্ছে না। ভালুকও তা বোঝায়নি।

'ওরা জানে তুমি এদিকে আসছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'জ্বী, সাহেব, জানে।'

'কোনও মেসেজ দেয়নি?'

'দিয়েছে, সাহেব,' বলল রানা, জোব্বার ভেতর থেকে হাতটা বের করে আনল। 'এই যে, এটা।' নষ্ট ফলের কপালে ঠেকিয়ে শটগানের ট্রিগার টেনে দিল ও।

এসপিওনাজ জগতে দু'মুখো সাপ সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রাণী; ওদেরকে মেরে রানার কখনোই কোন অনুতাপ হয় না, আজও

হলো না।

লাশ পড়তে না পড়তে বোল্ডারের আড়ালে স্টার্ট নিল ভেসপা। বুদ্ধিমান কসাই জান-প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

শালিমারের সামনে রিকশা থেকে নামতেই কৃষ্ণস্বামী গোপালা আর তাঁর দল ঘিরে ফেলল রানাকে। 'সারা শহর কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?' রাগ চেপে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে তাঁর, একটু তোতলাচ্ছেন। হঠাৎ খেয়াল হতে চোখ কপালে তুললেন। 'আপনার কাপড়চোপড়ের একি অবস্থা!'

'আমি খুব ক্লান্ত,' বলল রানা, হোটেলে ঢোকার জন্যে ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করল। 'কাল সকালে কথা হবে, প্লীজ।'

'থামুন, ওদিকে আর এগোবেন না,' বলল আইসিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। 'দিল্লী থেকে আপনাদের লোক এসে বসে আছেন লাউঞ্জে, বলছেন আপনার সঙ্গে কথা না বলে ফিরবেন না।'

'কে, কারা?' ব্যাপারটা বুঝতে পারছে রানা—ও যে আসলেই বাদল চৌধুরী, এটাকে আরও বিশ্বাস্যযোগ্য করতে চাইছে বাংলাদেশ দূতাবাস।

'আপনাদের দূতাবাসের ফার্স্ট ও থার্ড সেক্রেটারি।'

'ওঁদের বলে দিন, আমি দেখা করতে রাজি নই,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আমাকে পিছনের পথ দিয়ে হোটেলে ঢুকতে দিন।'

গোপালা ওর সঙ্গে স্যুইটের দরজা পর্যন্ত এলেন। রানা দূতাবাস কর্মকর্তাদের এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর রাগ পড়ে গেছে। ব্যস্ত ও ব্যাকুল একটা ভাব নিয়ে জানতে চাইছেন রাতে কি খাবে ও, ডিনার কি স্যুইটে পরিবেশন করতে বলবেন ইত্যাদি।

রানা তার কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তালা খুলে স্যুইটে ঢুকল, তারপর বলল, 'কাল সকালে কথা হবে, কেমন?'

'কিন্তু জরুরী একটা আলাপ ছিল,' রানা দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন গোপালা। 'কাল দুপুরে প্রফেসর হাসান যদি বলেন যে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না, তখন কি হবে?'

'আপনি ইন্টেলিজেন্স অফিসার হয়ে প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?' রানা বিরক্ত, সেটা গোপনও করছে না। 'প্রফেসর রুম সার্ভিসকে ডাকেন না? ওদের একজনের ইউনিফর্ম পরে আমি যদি তাঁর স্যুইটে ঢুকে পড়ি, উনি বাধা দেবেন কিভাবে?'

'ও, ইয়েস! থ্যাঙ্ক ইউ...' বললেন গোপালা, চোখ ছানাবড়া।

দরজা বন্ধ করে প্রথমেই রানা সুটকেস আর ব্রীফকেস চেক করল। স্যুইটে ঢুকেছিল ওরা, সুটকেস আর ব্রীফকেস দুটোই সার্চ করেছে। তবে আনাড়ি হাতে। ফলস বটমের সন্ধান পায়নি।

কাপড়চোপড় ছেড়ে শাওয়ারে দাঁড়ানোর আগে পকেট থেকে গণ্ডারের মানিব্যাগ আর চাবির রিঙটা বের করল রানা। রিঙে তিনটে সাধারণ চাবি, কোন তাৎপর্য বহন করে না। মানিব্যাগে কিছু টাকা পাওয়া গেল, সবই ভারতীয়। একটা ফটো রয়েছে–সম্ভবত কোনও হিজড়ার। ছোট্ট একটা কাগজ পাওয়া গেল–দেড় ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া। ভাঁজ খুলতে দেখা গেল তাতে হিন্দীতে লেখা রয়েছে–'বুধবার, চেনাব'।

নয়

নক করতে দরজা খুলে দিল শিখ দেহরক্ষীদের একজন, ট্রলি

নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। পরনে সদ্য ভাঁজ খোলা ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম; মাথায় টোপর আকৃতির হেডড্রেস। এটা সিটিংরুম; সোফায় বসে একটা ইংরেজি দৈনিকে চোখ বুলাচ্ছেন প্রফেসর হাসান, খালি পা দুটো নিচু টেবিলে তোলা। 'দুঃখিত,' বলে পা নামালেন, চোখ এখনও কাগজে।

দ্বিতীয় দেহরক্ষী খোলা জানালার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রানার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনুসরণ করছে সে। বন্ধ করার পর দরজার পাশেই অপেক্ষা করছে প্রথমজন। দু'জনেই প্রস্তুত। বিপদের সামান্যতম আভাস পেলেই কোমরে গোঁজা পিস্তলে হাত চলে যাবে।

রানাও ওর নিজের ল্যুগারটা নিয়ে এসেছে, আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না। ট্রলিটা টেবিলের পাশে থামিয়ে সিধে হলো ও, মাথার হেডড্রেস খুলে হাতে নিল, লুকিয়ে আনা পিস্তল এখন মুঠোর ভেতর। 'হ্যালো, প্রফেসর হাসান! চিনতে পারছেন আমাকে? আমি আপনার সহকারী, ডক্টর বাদল চৌধুরী।'

'ফ্রিজ!' একযোগে গর্জে উঠল দুই দেহরক্ষী, দু'জনের হাতেই বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। পরস্পরকে কাভার দিচ্ছে ওরা, একজন রানার পিছনে চলে এল।

হেডড্রেসটাকে রানা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে, কারণ ওর হাতে পিস্তল দেখলে দেহরক্ষীরা প্রথমে গুলি করবে, তারপর প্রশ্ন।

হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল, রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর হাসান।

'খুব অবাক হয়েছেন, তাই না?' জোর করে হাসল রানা, শুরু থেকেই ইংরেজিতে কথা বলছে। বুকটা ধড়ফড় করছে ওর। গোলাগুলি হবে কি হবে না, নির্ভর করছে প্রফেসর কি জবাব দেন তার ওপর। উনি যদি বেলুনটা ফাটিয়ে দেন, এখান থেকে যুদ্ধ

করে বেরুতে হবে ওকে। 'নাকি এখনও চিনতে পারছেন না? কি আশ্চর্য, আমি বাদল চৌধুরী!' থামতেই অনুভব করল খুলির পিছনে শক্ত কি যেন ঠেকল।

'প্রফেসর হাসান,' সামনে থেকে প্রথম দেহরক্ষী জিজ্ঞেস করল, 'কে এই লোক?'

চোখে রাজ্যের সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর হাসান। তারপর দেহরক্ষীর দিকে তাকিয়ে নার্ভাস একটু হেসে বললেন, 'কে মানে? ও আমার সহকারী বাদল, ড. বাদল চৌধুরী! চালাকি করে ঢুকে পড়েছে, এই যা।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'আমার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, তোমরা খেয়ে নাও। আমি ওর সঙ্গে আগে কথা বলি, তারপর খাব। এসো, বাদল...' রানার হাত ধরে একটা দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'কিন্তু, স্যার, আপনি ওর সঙ্গে একা কথা বলতে পারেন না!' রানার পিছন থেকে প্রতিবাদ করল দ্বিতীয় দেহরক্ষী।

ঘুরলেন প্রফেসর, কঠিন সুরে বললেন, 'তোমার সাহস তো দেখছি কম নয়! ওর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছ? সরাও ওটা!'

পিস্তল সরিয়ে নিল লোকটা। 'কিন্তু, স্যার, আপনি...'

'কোন কিন্তু নয়!' বললেন প্রফেসর হাসান। 'ওর সঙ্গে আমি একা কথা বলব, দরজা বন্ধ করে। আর কিছু শুনতে চাও তুমি?'

দুই দেহরক্ষী দৃষ্টি বিনিময় করল। একজন মাথা ঝাঁকাতে অপরজন বলল, 'ইয়েস, অফকোর্স! গো অ্যাহেড, প্লিজ।'

প্রফেসরের পিছু নিয়ে তাঁর বেডরুমে ঢুকল রানা। ওদের পিছু নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একজন দেহরক্ষী। 'স্যার, কথা বলার সময় খুব সাবধান কিন্তু!'

'ভাগো! যাও!' ধমক দিলেন প্রফেসর।

লোকটা ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল।

রানার দিকে তাকালেন প্রফেসর, কোঁচকানো ভুরুতে রাজ্যের উদ্বেগ। ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা আমার দুর্বলতার কথা জানে। ধমক দিলে মনে মনে হাসে। আপনি চালাকি করে ঢুকে পড়ায় সত্যি আমি খুশি হয়েছি।'

রানার কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে। ডিফেক্ট করতে চায় এমন বহু লোককে দেখেছে ও, তাদের আচরণের সঙ্গে প্রফেসর হাসানের আচরণ একেবারেই মিলছে না। উনি জানেন রানা বাদল চৌধুরী নয়, অথচ তারপরও ওকে রক্ষা করলেন। আবার বলছেন ও আশায় খুশি হয়েছেন। 'আসুন, কথা বলা যাক।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমার তো বলার কিছু নেই! যা বলার আগেই সব বলেছি!' তারপর ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন।

রানা ফিসফিস করল, 'কামরায় মাইক্রোফোন আছে?'

'হ্যাঁ,' গলা খাদে নামালেন প্রফেসর। 'টেবিল ল্যাম্পে লুকানো। খুঁজে বের করতে দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে আমার।'

'কিন্তু কেন? আপনি তো এখানে একা থাকেন।'

প্রফেসর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'যদি কেউ ঢুকে পড়ে–এই যেমন আজ আপনি ঢুকে পড়েছেন।' পিছু নিতে ইঙ্গিত করে একটা দরজা খুললেন। ছোট্ট একটা কিচেনে ঢুকল রানা। 'কফি চলবে তো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ, চলবে,' বলল রানা। 'আপনি ঠিক জানেন, এখানে কথা বলা নিরাপদ?'

'জানি।' গ্যাসের চুলো জ্বেলে কেটলি বসালেন প্রফেসর।

'আমি যতটুকু জানি, আপনি স্বেচ্ছায় ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। কিন্তু এখানকার পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে আপনার ওপর জোর খাটানো হচ্ছে।'

'আমাকে খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। ওরা আমাকে

আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইছিল না। কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি আপনি বাংলাদেশ সরকারের কোনও অফিসার হবেন। আপনার সঙ্গে কোনরকম কাগজ-পত্র আছে?'

রানার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। মাথা নাড়ল ও।

হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'এটাই প্রমাণ করে যে আপনি ভারতীয় চর নন। তা যদি হতেন, আপনার সঙ্গে জাল কাগজ-পত্র থাকত। আপনার নামটা কি বলুন তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ। আমি মাসুদ রানা—ধরুন দেশের নিরাপত্তার দিক নিয়ে মাথা ঘামাই।'

'দুধ? চিনি?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'দুধ নয়, চিনি।'

রানার হাতে কফির কাপটা ধরিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন আপনার মত কেউ একজন আসেন। যথেষ্ট হয়েছে, এবার চোখ বুজে সব কথা কাউকে আমার বলা দরকার।' রানার দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি, চোখ দুটো ছল ছল করছে। 'আমার জীবনে যা ঘটে গেছে বা ঘটছে তা যে-কোন গল্পকেও হার মানাবে, এতই অবিশ্বাস্য। কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।' তাঁর গলা ধরে এল। 'আমি বিশ্বাসঘাতক নই! আমি আমার দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনি, এখনও চাই না।"

'তাহলে আপনি এখানে কেন?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভারত সরকার কি আপনাকে জোর করে আটকে রেখেছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর হাসান। 'ভারত সরকার এরমধ্যে জড়িয়েছে অনেক পরে। আমিই ওদেরকে জড়িয়েছি। নষ্টের গোড়া আসলে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই। ওরা আমার স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।'

চুমুক দিতে গিয়েও কাপটা নামিয়ে রাখল রানা। ওর মাথার ভেতর ঝড় বইছে–তথ্যটা হজম করতে সময় লাগছে। এক অর্থে এমনটিই হবার কথা। কিন্তু তাতে আবার অনেক কিছু মেলে না। একটা প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত–প্রফেসর হাসান কি সত্যি ডিফেক্ট করতে চান না, পাকিস্তান বা ভারতে? রানাকে তিনি একটা মিথ্যে গল্প বানিয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন না তো?

রানার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর হাসান। 'আমার হিসাব যদি ভুল হয়ে থাকে, আপনি যদি বাংলাদেশ সরকারের কেউ না হন, তাহলে এইমাত্র আমি আমার স্ত্রী ও পুত্রকে খুন করেছি।'

'কিভাবে? ব্যাখ্যা করুন।'

ছোট্ট কিচেনে পায়চারি শুরু করলেন প্রফেসর হাসান। 'আমাকে ওরা হুমকি দিয়ে বলেছে, প্রকৃত ঘটনা আমি যদি কাউকে বলে দিই, ওদেরকে খুন করা হবে। তবু বললাম এই জন্যে যে পথের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে কারও সাহায্য পেলে হয়তো এখনও শেষ রক্ষা হতে পারে।'

কাপটা আবার তুলল রানা। 'এখানে আসার আগে আপনার স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে ঘুরলেন প্রফেসর হাসান। 'কোথায় দেখা হলো?'

'খুলনায়।'

'এক মিনিট, প্লীজ,' বলে দ্রুত বেডরুমে ঢুকলেন প্রফেসর, একটা টেবিলের দেরাজ খুলে কি যেন বের করলেন। আবার কিচেনে এসে রানার দিকে একটা ফটোগ্রাফ বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'দেখুন তো, আপনি এদের সঙ্গে কথা বলেছেন কিনা?'

ফটোটা নিয়ে দেখল রানা। খুলনায় দেখা মিসেস হাসান আর নেহালের ফটো। 'হ্যাঁ,' বলল ও। ফটোটা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হাতটা। ফটোটায় কি যেন একটা আছে।

'আরও ভাল করে দেখুন,' বললেন প্রফেসর।

ফটোটা আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। আরে, কি সাংঘাতিক! পার্থক্য তো সত্যি একটা আছে! ফটোর ভদ্রমহিলা একটু যেন বেশি রোগা। চোখে যদি মেকআপ ব্যবহার করে থাকেনও, তা অতি সামান্য। তাঁর নাক আর ঠোঁটের চারপাশে মুখের আকৃতি অন্যরকম, ফলে রানার দেখা মহিলার চেয়ে তাঁকে আরও সুন্দর লাগছে। ভাল করে তাকাতে ছেলেটার, নেহালের চেহারার সঙ্গেও পার্থক্য ধরা পড়ল। চোখ দুটো আরও কাছাকাছি, দৃষ্টি বাপের মতই অন্তর্ভেদী। ছেলেটা মায়ের মুখ পেয়েছে। নাহ্, রানা এই মুহূর্তে ফটোয় যাদেরকে দেখছে আর খুলনায় যাদের সঙ্গে কথা বলে এসেছে তারা এক মানুষ নয়। যত বেশি দেখছে, ততই বেশি বৈসাদৃশ্য ধরা পড়ছে। এমনকি কানগুলোও এক আকৃতির নয়।

'কিছু বলুন!' রুদ্ধশ্বাসে তাগাদা দিলেন প্রফেসর।

'এক মিনিট, প্লীজ,' বলল রানা। ওর অ্যাসাইমেন্টের সব কিছু এখন বদলে গেছে। অমীমাংসিত অনেক প্রশ্নের উত্তর এখন এক এক করে পেয়ে যাচ্ছে ও।

প্রথম কাজ বিসিআই হেডকোয়ার্টারকে খবরটা পৌঁছে দেয়া—খুলনায় ওই মহিলা আর ছেলেটা ভুয়া, আইএসআই-এর বসানো ডামি। খবর পেলে রাহাত খান বুঝতে পারবেন ওদেরকে নিয়ে কি করতে হবে।

প্রফেসর হাসানকে জোর করে ডিফেক্ট করানো হচ্ছে, এবং তা ভারতে নয়, পাকিস্তানে, এই তথ্য খাপে খাপে সব মিলিয়ে দিচ্ছে। হরভজন সিং আসলেই নষ্ট ফল, দু'মুখো সাপ, আইএসআই এজেন্ট। প্রথম সাদা রুমালও তাই ছিল। প্রফেসর হাসান তো অনেক আগে থেকেই ওদের হাতের মুঠোয়, কারণ তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে গোপনে জিম্মি করে রেখেছে তারা। ওদের নতুন মাথাব্যথা হয়ে দেখা দেয় প্রফেসরের সহকারী, বাদল

চৌধুরী। প্রফেসরের সঙ্গে ছলে-বলে-কৌশলে তাকেও ওরা পাকিস্তানে নিয়ে যেতে চাইছিল। প্রথম কারণ, গবেষণায় প্রফেসর হাসানকে সাহায্য করতে পারবে সে। দ্বিতীয় কারণ, সে যেন কোন অবস্থাতেই ভারতের হয়ে কাজ শুরু না করে। যন্ত্রটা ভারতও যদি পায় তাহলে মহাবিপদ!

ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে ভুয়া নেলী হাসানের বৈরি আচরণেরও। কিন্তু ভুয়া বলেই তার অভিনয়ে অনেক ক্রটি ছিল।

তবে, এখনও সব ধাঁধার সমাধান হয়নি। গোটা ব্যাপারটা যদি আইএসআই-এর ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে, প্রফেসর হাসানকে তারা পাকিস্তানে ধরে না নিয়ে গিয়ে কাশ্মীরে কেন নিয়ে এলো? এর কি উত্তর? 'প্রফেসর হাসান, মানলাম ওরা আপনার স্ত্রী ও ছেলে নয়। কিন্তু তারপরও সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন। তা না হলে আমি আপনাদের কোন সাহায্যেই আসতে পারব না।'

'থ্যাঙ্ক গড!' ফিসফিস করলেন প্রফেসর হাসান।

'প্রথমে বলুন কিভাবে ওদেরকে কিডন্যাপ করা হলো।'

'ব্যাপারটা শুরু হয়েছে প্রায় ছ'মাস আগে,' কিচেনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বললেন প্রফেসর মইনুল হাসান। 'একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি বাড়ির সামনে দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারজন লোক আমাদের সমস্ত ফার্নিচার তুলে ফেলেছে ওগুলোয়। নেলী আর নেহালকে কোথাও দেখতে পেলাম না। এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম, কি ঘটছে? সে জবাব দিল, তোমার বউ-বাচ্চাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যদি জীবিত দেখতে চাও আমরা যা বলি সেভাবে চলো।

'প্রথমে ভেবেছিলাম প্র্যাকটিকাল জোক। ওরা আমাকে খুলনার একটা ঠিকানা দিয়ে ওখানে যেতে বলল। ভাবলাম সরকার বোধহয় সিকিউরিটির কারণে চাইছে ঢাকার বদলে খুলনায় গবেষণা করি আমি, বন্ধু আমলাদের কেউ এই সুযোগে

কৌতুক করছে আমার সঙ্গে। কিন্তু খুলনায় গিয়েই আমার ভুল ভাঙল। ওই মহিলাকে দেখলাম। সঙ্গে ছেলেটিও আছে। মহিলা তার আসল নাম কোনদিনই বলেনি আমাকে। তবে সে আমাকে তার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে বাধ্য করল। বলল, আমি যদি তার নির্দেশ মত সহযোগিতা না করি তাহলে নেলী আর নেহালকে পাকিস্তানে নির্মম ভাবে খুন করা হবে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ছ'মাস বসবাস করলেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ দুটো উঁচু করে প্রফেসর পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আর কি করার ছিল আমার?'

'তারপর কি হলো?'

'তার কথা মত অফিসকে জানালাম, খুলনায় বাড়ি কিনে স্ত্রী-পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছি, মাসে দু'একবার গিয়ে দেখে আসব। সে আমাকে পরামর্শ দিল, কাজের অজুহাত দেখিয়ে আমি যেন আমার সমস্ত পুরানো বন্ধু-বান্ধবকে এড়িয়ে যাই। নেলী আর নেহালের কথা তুলতে সে আমাকে বলল, প্রথম যন্ত্রটা আগে পুরোপুরি তৈরি হোক, আমি ওটা নিয়ে পাকিস্তানে গেলেই নেলী আর নেহালকে ফিরে পাব। প্রতি মাসে খুলনায় গেলেই দেখতাম, পাকিস্তানী এজেন্টদের রিপোর্ট করছে সে। কাজেই বাধ্য হয়ে তার কথা মত চলতে হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু আপনি কাশ্মীরে কেন?' জানতে চাইল রানা। 'যন্ত্রটা কমপ্লিট করেছেন, সাফল্যের সঙ্গে টেস্ট করা হয়েছে—'

'হ্যাঁ। তারপরই ওটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওরা।'

'এখন তাহলে সেটা পাকিস্তানীদের হাতে তুলে দেবেন কি করে?'

প্রফেসর মাথা নাড়লেন। 'অত বড় যন্ত্র সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সরানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছে ওরা, তাই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তানে গিয়ে আবার একটা তৈরি করে দিতে হবে।

ঢাকায় আমার প্রজেক্টের নাম দেয়া হয়–ইউরেকা। কেউ টের পায়নি, শুরু থেকেই আইএসআই-এর একজন এজেন্ট টেকনিকাল হ্যান্ড হিসেবে ঢুকে পড়ে প্রজেক্টের ভেতর। তার কাছ থেকেই নিয়মিত আমার গবেষণার বিষয় ও অগ্রগতির রিপোর্ট পাচ্ছিল পাকিস্তান। যন্ত্রটা তৈরি শেষ হওয়ার ঠিক ছয়মাস আগেই ধরা পড়লাম ওদের জালে।

'শিমলায় আসতে ওরাই বাধ্য করেছে আমাকে। অধৈর্য হয়ে পড়েছে ওরা। পাকিস্তানে পাচার করতে সুবিধে হবে বলে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

'রিয়াসিতে এসে আমি ওদেরকে বললাম, এভাবে হঠাৎ আমাকে পাকিস্তানে নিয়ে গেলে কোন লাভ হবে না, কারণ ডিজাইন কমপ্লিট করতে হলে ঢাকায় রেখে আসা কাগজ-পত্রের সাহায্য লাগবে আমার। ওরা তখন বলল, প্রথমে আমাকে পাকিস্তানে পাচার করবে, তারপর ঢাকা থেকে কাগজ-পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আমি বেঁকে বসলাম, বললাম, কাগজ-পত্র ছাড়া আমি পাকিস্তানে যাব না। আমার এই জেদ কঠিন বিপদে ফেলে দিল ওদেরকে। কারণ, রিয়াসিতে আমার উপস্থিতি শুরু থেকেই ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ভাল চোখে দেখছিল না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল ওরা। আর কোন উপায় না দেখে আইএসআই আমাকে দিয়ে ইন্ডিয়ান নিউজ এজেন্সিকে টেলিফোন করাল। আমি জানালাম, ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছি। আইএসআই আমাকে দিয়ে কাজটা শুধু একটা কারণে করাল, হাতে যাতে কয়েকটা দিন সময় পাওয়া যায়।

'আমি যাতে ভারতীয়দের মুঠোয় চলে না যাই সেদিকে লক্ষ রাখার জন্যে আইএসআই স্থানীয় একটা কোম্পানি থেকে দু'জন শিখ দেহরক্ষী নিয়োগ করেছে। ওরা আসলে আইএসআই-এরই এজেন্ট–এসপিওনাজ জগতে এদেরকে বলা হয় স্লীপার–আমার ধারণা, এ-ব্যাপারটা আমার চেয়ে আপনি আরও ভাল জানেন।

'সে যাই হোক, এখন বিপদের কথাটা বলি। ওরা কাল বিকেলে আমাকে জানিয়েছে ওদের এজেন্ট ইউরেকা প্রজেক্ট থেকে প্রয়োজনীয় সব কাগজ-পত্র সরিয়ে ফেলেছে। আজ শুক্রবার, সে রিয়াসিতে পৌঁছোবে বুধবারে। ওই বুধবারেই আমাকে ওরা পাকিস্তানে পাচার করবে।'

'কিন্তু আমি শুনেছি যন্ত্রটা তৈরির কৌশল বা ডিজাইন কিছুই লিখিতভাবে নেই...'

'ঠিকই শুনেছেন,' বললেন প্রফেসর হাসান। 'তবে কেউ চুরি করতে চাইতে পারে ভেবে সেফটি ভল্টের ভেতর কিছু কাগজ-পত্র রাখা হয়েছিল, সবই ভুয়া...'

রানা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। গণ্ডারের মানিব্যাগে পাওয়া কাগজের টুকরোটায় লেখা আছে 'বুধবার–চেনাব'। ও ভাবল, চেনাব যদি কোন মোটরবোট হয়, আগামী বুধবারে ওটায় তুলেই কি পাচার করা হবে প্রফেসরকে? ও জানতে চাইল, 'কিন্তু পাচার করার আগে হোটেল থেকে বের করতে হবে আপনাকে, তাই না? সেটা কিভাবে সম্ভব? বাইরে তো ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স আর আর্মির লোক একেবারে গিজগিজ করছে।'

'এটা একটা প্রাসাদ ছিল, সবগুলো গোপন পথের সন্ধান সবাই জানে না,' বললেন প্রফেসর। 'গব্বর সিং আর যশোবন্ত সিং-এর কাছে প্রাসাদের পুরানো একটা নকশা দেখেছি আমি...'

জরুরী প্রশ্ন একের পর এক ভিড় করছে রানার মনে। 'আপনার স্ত্রী আর ছেলেকে পাকিস্তানের কোথায় রাখা হয়েছে বলতে পারবেন?'

প্রফেসর মাথা নাড়লেন, তারপর কপালটা আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বললেন, 'না। শুধু জানি পাকিস্তানের কোন ক্যান্টনমেন্টে আটকে রাখা হয়েছে। এমন একটা ক্যান্টনমেন্ট, যেটার পাশ দিয়ে নদী চলে গেছে। গব্বর আর যশোবন্ত আমাকে ভয় দেখিয়ে একবার বলেছে, আমি যদি সহযোগিতা না করি, ওদেরকে নদীতে

চুবিয়ে মারা হবে।'

'নদীটা কি চেনাব?'

'হতে পারে, আমি জানি না।'

'ওরা কখনও চেনাব নামে কোন লঞ্চ, ইয়ট বা মোটরবোট নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করেছে?'

'না,' বললেন প্রফেসর। 'তবে আড়াল থেকে ওদেরকে বলতে শুনেছি, হোটেল থেকে বের করার পর শাহিন নামে কারও হাতে তুলে দেয়া হবে আমাকে। এই শাহিন আমাকে নৌকায় করে জঙ্গিদের কাছে নিয়ে যাবে।'

রানা ভুরু কোঁচকাল। সেই সুদর্শন তরুণও তাহলে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। 'এই শাহিন সম্পর্কে আর কি জানেন আপনি?'

'আর তো কিছু জানি না...না, দাঁড়ান! হ্যাঁ, মনে পড়ছে। শাহিনকে ওরা বিশেষ পছন্দ করে না। সে স্থানীয় একজন গেরিলা, প্রচণ্ড সাহসী, কিন্তু বয়স একদম কম। পাকিস্তানী জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমন ভাল নয়। তবু আমাকে জঙ্গিদের হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব তাকেই দেয়া হবে। তারপর জঙ্গিরা আমাকে পাকিস্তানের ভেতর কোথাও নিয়ে যাবে।'

তথ্যগুলো মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা। 'আর কিছু মনে পড়ে কিনা ভেবে দেখুন।'

'গব্বর সিংকে বলতে শুনেছি, শাহিন যদি বেশি বেআদবি করে তাহলে আইএসআই-এর কর্তাকে সে অনুরোধ করবে এরপর থেকে যেন ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানায় অস্ত্রের চালান পাঠানো না হয়।'

'এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে মিসেস হাসান ও নেহালকে পাকিস্তান থেকে বের করে আনা,' বলল রানা। 'মিসেস হাসানকে দেখাবার জন্যে একটা কিছু লিখে দিন আমাকে।' বলছে বটে,

তবে মনে মনে জানে এর চেয়ে কঠিন কাজ দুনিয়ার বুকে খুব কমই আছে। কেননা, ওদেরকে একটা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করে রাখা হয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া একটা ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটানো সম্ভব নয়। একা একটা ক্যান্টনমেন্টের বিরুদ্ধে কতটা কি করতে পারবে ও কে জানে!

তবে সে-কথা পরে ভাবলেও চলবে। এই মুহূর্তে ওকে এখনকার যুদ্ধের কথা ভাবতে হবে। গব্বর আর যশোবন্ত আইএসআই-এর রোপণ করা স্লীপার এজেন্ট, অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে বহু বছর ধরে ওদেরকে রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। স্লীপার এজেন্টদের কাভারটাই সবচেয়ে দামী, ওটা একবার নষ্ট হয়ে গেলে ওদের আর কোন মূল্য নেই। প্রফেসর হাসান বাদল চৌধুরীর সঙ্গে নিভৃতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করায় ওরা নিঃসন্দেহে ধরে নেবে অনেক গোপন তথ্যই তিনি ফাঁস করে দেবেন, এমনকি ওরা যে আইএসআই-এর এজেন্ট এ-কথাও হয়তো আর গোপন থাকবে না। কাজেই ওরা কোন ঝুঁকি নেবে না। ঝুঁকি যে নেবে না তার প্রমাণ বেডরুমের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে ওরা।

এখন কি হবে? রানা স্যুইট থেকে বেরিয়ে যাবার সময়? কল্পনায় দৃশ্যটা দেখতে চেষ্টা করল রানা। নক করতে দরজার তালা খুলে দিল গব্বর সিং। আড়াল থেকে যশোবন্ত সিং তাকে কাভার দিচ্ছে। গব্বর সিং পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বলবে তারা বাদল চৌধুরীকে এই স্যুইট থেকে চলে যেতে দিতে পারে না। কাজেই বাদল চৌধুরী যেন টেলিফোনে সংবাদ সংস্থাকে জানায় প্রফেসর হাসানের মত সে-ও ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছে। তাদের এই প্রস্তাবে সে রাজি হলে ভাল। আর রাজি না হলে গব্বর সিং এক পাশে সরে দাঁড়াবে, অমনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাদল চৌধুরীর খুলি উড়িয়ে দেবে যশোবন্ত সিং।

পরে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কি

খুব কঠিন হবে? মনে হয় না। ওদের ব্যাপারে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ওরা যদি বলে যে ওদেরই একটা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে প্রফেসর হাসানকে বাদল চৌধুরী খুন করতে যাচ্ছিল, সেটা তারা অবিশ্বাস করবে না।

'দরজা দিয়ে নয়,' প্রফেসরকে বলল রানা, 'আমি বেরুব জানালার গ্রিল খুলে। দশ মিনিট পর ওদেরকে জানাবেন আপনি টয়লেটে গিয়েছিলেন, বেরিয়ে দেখেন আমি নেই। ঠিক আছে?'

হাসি চেপে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন প্রফেসর হাসান, তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে না?'

'হবে। তখন আমার সঙ্গে ওঁরা দুজনও থাকবেন।'

কিচেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রানা দেখল, সরাসরি নিচে সরু একটা প্যাসেজ, তারপর হোটেলের দোতলা স্টাফ কোয়ার্টার।

পাইপ বেয়ে মাত্র বারো ফুট নামতে হলো ওকে। স্টাফ কোয়ার্টারেব ছাদ হয়ে চলে এল হোটেল কমপাউন্ডের পিছনে। এদিকে সিঁড়ি আছে, ধাপ বেয়ে নিচে নামল, উঠান হয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পরনে ইউনিফর্ম থাকায় কেউ কিছু বলল না ওকে।

দশ

শালিমার ইন্টারন্যাশনালে ফেরার আগে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে ঢুকল রানা। বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার একটা

নম্বরেই ফোন করল, তবে খোঁজ নিলেও এই নম্বর কেউ ট্রেস করতে পারবে না। কাঁচ দিয়ে ঘেরা খুপরির ভেতর একা রানা, কথা বলল বাংলায়–শুধু বলে গেল, উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল যোগাযোগ। 'বউ-বাচ্চা ভুয়া। টেকনিকাল হ্যান্ড কাগজ-পত্র চুরি করে সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করছে। এখানে আমার কাজ বদলে গেছে, সীমান্ত পেরিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বউ-বাচ্চা আনতে যেতে হবে। হাঁস আমাদেরই আছে, তবে ভয় পাচ্ছি তাকে না জবাই করা হয়। এখানে প্রভাবশালী কারও উপস্থিতি দরকার, তা না হলে স্লীপার গব্বর আর যশোবন্ত কি করে বসে বলা মুশকিল।'

রানা হোটেলে ফিরল পিছনের গেট দিয়ে। ও যে লেডি সুরাইয়া'স ইন থেকে বেরিয়ে এসেছে, এ-খবর ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা এখনও সম্ভবত জানে না। জানলে পিছনের গেটে কেউ না কেউ থাকত।

আজ সকাল থেকে আইসিআই অফিসারদের সবাইকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত দেখছে রানা। স্বাভাবিক। মাত্র ষাট মাইল দূরে ওদের একজন এজেন্ট খুন হয়েছে কাল রাতে। ঠিক ওই সময়টা নিখোঁজ ছিল বাদল চৌধুরী। ফলে ওর দিকে তারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ব্যাপারটা আসলে তারা মেলাতে পারছে না। ড. বাদল চৌধুরী একজন বিজ্ঞানী, তার পক্ষে বিদেশের মাটিতে খুন-খারাবিতে জড়িয়ে পড়া প্রায় অসম্ভব, বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া, একজন ভারতীয় এজেন্টকে সে কেন খুন করবে, যদি না পাকিস্তানের চর হয়? আর পাকিস্তানের চর হলে ভারতীয় এজেন্টের সঙ্গে দু'জন পাকিস্তানী জঙ্গিকে কেন সে খুন করতে যাবে?

রানার ধারণা, ব্যাপারটাকে ওরা পাকিস্তানী জঙ্গিদের একটা অপারেশন বলে ধরে নিয়েছে। তবে তাতেও ঘটনাটার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় এজেন্ট আর

জঙ্গিদের লাশ একই জায়গায় পাওয়া যায়নি।

নতুন এক প্রস্থ সুট পরে একটু পরই আবার পিছনের দরজা দিয়ে শালিমার ইন্টারন্যাশনাল থেকে বেরিয়ে এল রানা। কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল কে জানে, ওর পিছু নিল অভিজিৎ খের।

খেরকে দেখেই হরভজন সিং-এর কথা মনে পড়ে গেল রানার। সিংই ওকে সাদা রুমালের কথা বলেছিল। সেই সাদা রুমাল অর্থাৎ দু'মুখো সাপকে প্রথমে দেখেছে ও খেরের সঙ্গে, তারপর হাজী ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানায়। হরভজন সিংও একটা দু'মুখো। দিল্লীতে থাকলেও, সাদা রুমালের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে সে। সে-ও গব্বর আর যশোবন্তর মত আইএসআই স্লীপার কিনা কে জানে। স্লীপার হলে তার কাভার এতটাই নিশ্ছিদ্র হবে যে সাদা রুমালের পরিণতি দেখেও পালাবার কথা ভাববে না। তবে পালাক বা না পালাক, রানার কর্তব্য তার কাভার অর্থাৎ বেলুন ফাটিয়ে দেয়া।

তবে এত ব্যস্ততার কিছু নেই, কাজটা পরে কোন এক সময় করলেও চলবে। এই মুহূর্তে অভিজিৎ খেরকে খসানোটা জরুরী। কারণ চেনাবের খোঁজে নাওয়ানশাহরে যাবে রানা। ইতিমধ্যে যে-সব তথ্য পেয়েছে, তা থেকে ধরে নেয়া চলে চেনাব জলযান, আগামী বুধবারে ওটাতে করেই প্রফেসর হাসানকে পাকিস্তানে পাচার করা হবে।

ওর হাতে সময় আছে মাত্র চারদিন। বুধবারের আগেই পাকিস্তানের একটা ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে মিসেস নেলী হাসান আর নেহালকে ছিনিয়ে আনতে হবে ওর। নিজের ঘাড়ে স্বেচ্ছায় এরকম একটা অসম্ভব কাজের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে ও যে খুব একটা স্বস্তিতে আছে, তা নয়; ব্যাপারটা ভাবতে গেলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। তবে জানে, এর কোন বিকল্প নেই। প্রফেসর মইনুল হাসান দেশের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে হবে।

পাকিস্তানে ঢোকার জন্যে পাকিস্তানীদেরই সাহায্য নেয়ার প্ল্যান করছে রানা। চেষ্টা করে দেখবে ওদের জলযান চেনাব দখল করা যায় কিনা। তারপর ওটা নিয়েই সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়বে ভারতের জন্মশত্রু পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে। রানা আশা করছে তরুণ কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধা শাহিন ওকে আর কিছু দিয়ে না হোক, মূল্যবান দু'একটা তথ্য দিয়ে হয়তো সাহায্য করবে। দেখা যাক।

নওয়ানশাহর দক্ষিণ-পশ্চিমে। রানা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একেবারে উল্টোদিকে ছুটন্ত একটা বাসে, কপালে লেখা রয়েছে ভেরনাগ। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়, তাই গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল ও; গলা বের করে দেখল হাত তুলে একটা প্রাইভেট কার থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল অভিজিৎ।

পাহাড়ী এলাকা, দুই স্টপেজ পরই আবার বাসটা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় ছোকরা কন্ডাক্টারের হাতে একটা কয়েন গুঁজে দিয়ে এক লাফে নেমে রাস্তা পেরুল রানা, আরেকটা বাস ধরে ফিরে এল রিয়াসিতে, তৃতীয় বাস ধরে নাওয়ানশাহরে পৌঁছল বেলা তিনটের কিছু পর।

নওয়ানশাহর কাশ্মীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী-বন্দর। বন্দর হওয়াতে চোরাচালানীদের হয়েছে পোয়াবারো। নদীপথে আধমাইল এগোলেই পাকিস্তান। এপারে কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টকে অত্যন্ত তৎপর দেখা গেল। পাকিস্তান থেকে প্রচুর লোক নিয়ে একের পর এক লঞ্চ আসছে। এই সব লঞ্চের জন্যে আলাদা টার্মিনাল রয়েছে। কাস্টমস অফিসাররা পাসপোর্ট আর ভিসা চেক করছে, আর্মির সদস্যরা চেক করছে লাগেজ ও কার্গো। ঘুরেফিরে কিছুক্ষণ দেখার পর রানা খেয়াল করল, এঞ্জিনচালিত ছোট আকৃতির নৌকাগুলো অবাধে চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে, সবগুলোতেই কম বেশি আরোহী আছে। ওই

একইভাবে পাকিস্তান থেকেও আসছে। তবে ওপার থেকে আসা প্রতিটি নৌকাকে ভিড়তে হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটা জেটিতে। সেখানেও কাস্টমস অফিসার আর সৈনিকরা তৎপর।

চেনাব নামে আদৌ যদি কোন পাকিস্তানী লঞ্চ নদীতে থাকে, সেটা ওপারেই থাকার কথা। রানার সঙ্গে পাসপোর্ট থাকলেও, ভিসা নেই। লোকজন যে হারে আসা-যাওয়া করছে, তাৎক্ষণিক ভিসা ইস্যু করার ব্যবস্থা থাকাটা বিচিত্র নয়, একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে ওকে। কিন্তু ভিসা পেলেই বা কি, চেনাব নামে জলযানটিকে আগে থেকে চিনে রাখতে না পারলে ওপারে গিয়ে করবেটা কি ও? ওপারে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করাটা বিপদও ডেকে আনতে পারে।

কিন্তু ওপারের বন্দরে লঞ্চ আর নৌকা এত বেশি, দূরত্বও মাইল দেড়েক, কোন একটি বিশেষ লঞ্চকে চিনতে পারা অসম্ভব।

ভিসা পাওয়া যাবে কিনা খোঁজ নিতে টার্মিনাল ভবনে ঢুকল রানা। দোকানে সাজানো রয়েছে দেখে দুশো রুপি দিয়ে ছোট একটা বিনকিউলার কিনল প্রথমে। তাইওয়ানে তৈরি, ঢাকায় এটার দাম হাজার টাকার কম নয়। কাস্টমস জানাল, পাকিস্তানে বেড়াবার জন্যে ট্যুরিস্ট ভিসা দেয়া হয়–কোন ঝামেলা নেই, ফী দিলেই পাওয়া যাবে। এপারে শুধু সার্চ করা হবে।

বিনকিউলার নিয়ে টার্মিনাল ভবনের ছাদে উঠে এল রানা। আধঘণ্টা ধরে ওপারের বন্দরে চোখ বোলাবার পর ওর আশা পূরণ হলো। সত্যি আছে। চেনাব আসলে পুরনো একটা লঞ্চ। উর্দু হরফগুলো এত অস্পষ্ট যে প্রথমে রানার চোখেই পড়েনি। পরবর্তী দৃশ্যটা রানাকে উত্তেজিত করে তুলল। লঞ্চের একটা কেবিন থেকে তিনজন লোককে ডেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও, তাদের মধ্যে একজন সেই কসাই, হাজী ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানায় যে জঙ্গি লোকটা ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ওপর। পরে এই লোকই দু'মুখো সাপের সঙ্গে রানার জন্যে

পাহাড়ী পথে অ্যামবুশ পাতে।

কসাইয়ের হাতে একটা বিনকিউলার, চোখে তুলছে। তাড়াতাড়ি নদীর দিকে পিছন ফিরল রানা, শান্তভাবে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে ছাদ থেকে নেমে এল।

বাজারে ঢুকে কিছু কেনাকাটা করল রানা। স্থানীয় হিন্দু জেলেরা সাদা ফতুয়া আর ধুতি পরে, ওদের গ্রামে ঢুকে নৌকা চুরি করতে হলে এই বেশ দরকার হবে ওর। আর কিনল বড় একটা পলিথিনের ব্যাগ।

এম.ভি. চেনাবে রাতের অন্ধকারে ঢুঁ মারতে যাবে রানা, কিন্তু তার এখনও দেরি আছে। লোকজনের ভিড়ে ঘুরে বেড়ানোটা বোকামি হবে, কারও চোখে পড়ে যেতে পারে, তাই একটা টাঙ্গা নিয়ে রওনা হলো ইউনুস মোল্লার মুসাফিরখানার দিকে। রওনা হলো ঠিকই, কিন্তু মোটর ভেহিকেল চেনাবকে পিছনে ফেলে রেখে যেতে মনটা খুঁতখুঁতও করছে। কসাইয়ের হাতে বিনকিউলার দেখেছে, সেটাই কারণ। লঞ্চে কারও পৌঁছানোর কথা ছিল, কিন্তু পৌঁছায়নি? আড়াল থেকে ওটার ওপর নজর রাখতে পারলে আরও কিছু হয়তো দেখার সুযোগ হত।

নির্জন এলাকা পার হয়ে এল টাঙ্গা। ব্যাপারটা দূর থেকে দেখতে পেল রানা। গোটা এলাকা খাঁ খাঁ করছে। মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত নেই। টাঙ্গাঅলা লাগাম টেনে ধরল, ওদিকে সে যাবে না। তাকে অপেক্ষা করতে বলে পায়ে হেঁটে একাই রওনা হলো রানা। মুসাফিরখানায় কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবু একবার চেষ্টা করে দেখছে ও। জীবনে হয়তো আর কোনদিন এদিকে আসা হবে না, সুযোগ যখন আছে তখন মোল্লা চাচার সঙ্গে দেখা করে একটা ধন্যবাদ দেয়া যাক। বিপদের সময় তিনি ওকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। তবে শাহিনের সঙ্গে দেখা হবে, এই আশাটাও উঁকি দিচ্ছে মনে।

কিন্তু মুসাফিরখানা অন্ধকার দেখল রানা, দরজায় তালা ঝুলছে। দালানটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে এল; নাহ্, ভেতরে কোন সাড়া-শব্দ নেই। টাঙ্গা নিয়ে বন্দরে ফিরে এল ও। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা লেগে এসেছে।

নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে হাঁটতে জেলে পাড়াটা দেখে এল রানা। ছোট্ট একটা গ্রাম, বন্দর থেকে মাইল দেড়েক দূরে। দেখে শুনে বুঝল, নৌকা চুরি সহজ হবে না, মারাত্মক ঝুঁকিও আছে। জেলেরা সম্ভবত চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত, তা না হলে গ্রামের গা ঘেঁষে সৈনিকদের ক্যাম্প থাকবে কেন। নদীতে এরইমধ্যে গানবোটের টহল শুরু হয়ে গেছে। শুধু গানবোট নয়, ছোট ছোট স্পীডবোট নিয়েও আসা-যাওয়া করছে নৌ-বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা। হঠাৎ খুব কড়াকড়ি শুরু হয়েছে, নাকি এখানে এরকমই চলে, জানার কোন সুযোগ নেই রানার।

বন্দরের কাছাকাছি ফিরে এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে রাতের খাওয়াটা সেরে নিল রানা।

সন্ধ্যার পর এখন আর নৌকা ভাড়া করে পাকিস্তানের দিকে যাবার সুযোগ নেই ওর। টার্মিনাল ভবনের নোটিশ বোর্ডে লেখাটা দেখেছে রানা–'সন্ধ্যার পর নদী পারাপারের অনুমতি নেই, কোন জলযানকে সীমান্ত পেরুতে দেখা গেলে গুলি করা হবে।' জেলেদের নৌকা চুরি করা সম্ভব না হলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে। কিন্তু তাতে আবার অন্য সমস্যা দেখা দেবে। দিনে-দুপুরে ব্যস্ত নদী বন্দর থেকে হাইজ্যাক করতে হবে এম.ভি. চেনাবকে। সেটা একেবারেই অসম্ভব।

জেলে পাড়ায় যাবার পথেই পড়ল সিনেমা হলটা। বিশাল বিলবোর্ডে জোকারবেশী শাহরুখ খানের নাচের ভঙ্গি। ছবির নাম ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানী। ভেতরে ঢুকে টিকিট কাউন্টারকে পাশ কাটাল রানা, দেয়ালঘড়িতে চোখ পড়তে দেখল পৌনে ন'টা।

দশ মিনিট পর টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল ধুতি ও ফতুয়া পরিহিত মাসুদ রানার ধীবর সংস্করণ, কাঁধে একটা পোঁটলা, পোঁটলার ভেতর পলিথিন ব্যাগে সুট, সুটের পকেটে ল্যুগার আর ছুরি। একটা গ্যাসবোমাও আছে, তবে সেটা শরীরেই লুকানো থাকল, বাম বগলের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো।

কাঁচা বাজারে ঢুকে এক কেজি লাউ শাক কিনল রানা; কাঁধ থেকে নামানো পোঁটলাটা এখন বাজারের ব্যাগ, সেটা থেকে লাউ গাছের সবুজ ও লকলকে ডাঁটা বেরিয়ে আছে।

জেলে পাড়াটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। সৈনিকদের ক্যাম্পটাকে পাশ কাটাবার সময় কেউ একজন ওর গায়ে টর্চের আলো ফেলল। রানা থামল না, তবে অদৃশ্য লোকটার উদ্দেশে স্থানীয় উচ্চারণে বলল,'নমস্তে জ্বী!'

একশো গজ দূরে নির্জন ঘাট। ছোট্ট, কাঠের জেটি। অন্ধকারে একবার থামল রানা, কান পেতে অপেক্ষা করছে। না, কেউ পিছু নেয়নি।

ছোট বড় কয়েক ডজন নৌকা ভাসছে নদীতে। ছোট্ট একটা ডিঙ্গি বাছাই করল রানা। রশি খুলে পানিতে বৈঠা চালাল, যতটা পারা যায় কম শব্দ করছে। নদীর উজান থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। অনেক দূরে, কাজেই রানা বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

প্রথম এক ঘণ্টা নদীর কিনারা ঘেঁষে এপারেই থাকল রানা, স্পীড আর গানবোটের আসা-যাওয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছে। দূরে কোথাও আরও দু'তিনবার গুলি হলো। বিশ মিনিট পরপর দুদিক থেকে একটা করে গানবোট আসছে, বন্দরের কাছাকাছি পরস্পরকে পাশ কাটাচ্ছে ঘণ্টায় আট কি নয় নট স্পীডে। মাঝ নদী ফাঁকা পড়ে আছে, কোন লঞ্চ বা নৌকা এ-পার ও-পার করছে না। প্রায় ওই একই সময়ে পাকিস্তানী জলসীমাতে ওদেরও দুটো গানবোট পরস্পরকে পাশ কাটাচ্ছে, ওই একই স্পীডে। বিশ মিনিট পরপর বন্দরের পানি চারটে

সার্চলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তারপর আবার অন্ধকার। স্পীড বোটগুলোর গতি খুব বেশি, ওগুলো ছুটোছুটি করছে আলো না জ্বেলেই, সময়েরও কোন ছক অনুসরণ করছে না। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল রানা। নদীর কিনারা ঘেঁষে বেশ কিছু নৌকা এখনও চলাচল করছে, সেগুলোর মধ্যে দু'একটা মাছ ধরার নৌকাও আছে। স্পীডবোটের সৈনিকরা দেখেও কিছু বলছে না। কিন্তু তারপরই যেটা ঘটল, দেখে রানার অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে উঠল।

ওর মতই ছোট্ট একটা জেলে নৌকা নিয়ে তিনজন লোক নদী পেরিয়ে ওপারে রওনা হলো, গানবোট দুটো পরস্পরকে পাশ কাটাবার দু'মিনিট পরই। তিনটে বৈঠা ছপ ছপ করে ঘন ঘন বাড়ি মারছে পানিতে। লোকগুলোর ব্যস্ততাই বলে দিচ্ছে তারা স্মাগলার। আশপাশেই কোথাও ওত পেতে অপেক্ষা করছিল একটা স্পীডবোট; নৌকাটা মাঝনদীতে পৌঁছাবার আগেই সগর্জনে ছুটে এল সেটা। পরবর্তী দৃশ্যটা রোমহর্ষক। পালানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে জেলে নৌকার তিন আরোহী বৈঠা ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সময় স্পীডবোট থেকে সার্চলাইট ফেলা হলো। রানা দেখল হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে নৌকার আরোহীরা। তিনজনেরই খালি গা, পরনে শুধু ধুতি। দৃশ্যটা খুব করুণ লাগল ওর। পরমুহূর্তে শুরু হলো রক্তের হোলি খেলা। একযোগে গর্জে উঠল কয়েকটা কারবাইন। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের তৈরি গর্ত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখল রানা। শুরু করার পর সৈনিকরা থামছেই না। দুটো লাশ নদীতে পড়ল, একটা নৌকায়। নৌকাও ক্ষতবিক্ষত হলো, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে স্রেফ উঁড়ে গেল। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে সব। ইউ টার্ন নিয়ে আরেক দিকে চলে গেল স্পীডবোট।

এখন রানা বুঝতে পারছে চেনাবে গুলির শব্দের কি অর্থ।

গোটা ব্যাপারটা অমানবিক লাগলেও, এ নিয়ে মাথা ঘামানোর

সময় কোথায় রানার। একটু আগে স্মাগলারদের পিছু নেয়ার কথা ভাবছিল ও। তা নিলে ওর অবস্থাও ওদের মতই হত।

ওর মনে হলো, নদী পেরুবার এখনই সময়, কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের পর সৈনিকরা যখন ধরে নেবে বাকি স্মাগলাররা সাবধান হয়ে গেছে।

পলিথিনের ব্যাগটা নিয়ে নৌকা থেকে পানিতে নামল রানা, স্রোতের টানে ডিঙ্গি অন্ধকারে হারিয়ে যাবার পর মাথা নিচু করে সাঁতার শুরু করল। দশ মিনিট পর মনে হলো কাল্পনিক সীমান্ত রেখাটা পেরিয়ে নদীর পাকিস্তান অংশে চলে এসেছে ও। তবে ভয়ের কারণ হলো, নদীর দুই অংশেই এখন গানবোট চলে আসবে।

এবারও একই সঙ্গে দুই জোড়া গানবোট এল, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরকে পাশ কাটাল ওগুলো। সার্চলাইটের আলো ছুটে আসছে দেখে পানির তলায় কিছুক্ষণ ডুবে থাকল রানা। গানবোট চলে যাবার পর ভাসমান খানিকটা কচুরিপানা পেয়ে গেল ও, সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সোজা এসে ভিড়ল এম.ভি. চেনাবের গায়ে।

বিকেলে লঞ্চের গায়ে একটা নৌকা দেখেছিল রানা, এখন সেটাকে দেখছে না। নোঙরের চেইন বেয়ে উঠে ডেকে উঁকি দিল, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কন্ট্রোল রুম অন্ধকার, তবে পাশের একটা কেবিনে আলো জ্বলছে।

ব্যাগ থেকে গেঞ্জি বের করে পা আর পায়ের পাতা মুছল রানা, তারপর রেইলিং টপকে ডেকে নামল। এখন যদি হঠাৎ কেউ বেরিয়ে আসে ডেকে, রানা বসে পড়লে অন্ধকারে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। ধুতি আর ফতুয়া খুলে ট্রাউজার আর শার্ট পরল দ্রুত। ল্যুগারটা বেল্টে গুঁজে রাখল, হাতে থাকল ছুরিটা। মাথা নিচু করে এগোচ্ছে, ওয়াকওয়ে ধরে নিঃশব্দ পায়ে জোড়া কেবিনের পোর্ট সাইডে চলে এল। আফটার ডেকে পৌঁছে দেখল

প্রথম কেবিনের সামনে তিনজন লোক ঘুমাচ্ছে। এরা সম্ভবত ক্রু। ওদেরকে টপকে কেবিনের দিকে এগোল রানা। কোন দরজা নেই, শুধু হাঁ করা একটা মুখ। কোন নড়াচড়া নেই। শব্দ বলতে ঘুমন্ত তিন ক্রুর নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ। ভেতরে ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না রানা, প্রথমে দেখা উচিত আলোকিত কেবিনে কেউ জেগে আছে কিনা।

অন্ধকার কেবিনটার সামনে থেকে পিছু হটে দ্বিতীয় কেবিনের পোর্টসাইডে চলে এল রানা, পোর্টহোলের কিনারা দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল। এই কেবিনটা প্রথমটার চেয়ে ছোট। বাঙ্কের শুধু কিনারাটা দেখতে পেল রানা। কেউ শুয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। টেবিলটা ছোট, দু'পাশে তিনটে ডেক চেয়ার। দু'জন লোক মুখোমুখি বসে আছে, একজন সেই কসাই। টেবিলের ওপর মান্ধাতা আমলের পুরনো একটা রেডিও। আলোকিত ডায়াল দেখে বোঝা গেল সেটটা অন করা রয়েছে। কান পাততে যান্ত্রিক শব্দজটও শুনতে পেল রানা।

লোক দুটো একচুল নড়ছে না। টেবিলে কনুই রেখে রেডিওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে দু'জনেই, চেহারায় চাপা উত্তেজনা।

এক দুই করে পাঁচ মিনিট পার হলো। তারপর দশ মিনিট। লোক দু'জন মাঝেমধ্যে নড়েচড়ে বসছে, তবে ভুলেও একবার রেডিওর ওপর থেকে চোখ তুলছে না। সন্দেহ নেই, জরুরী কোন মেসেজের অপেক্ষায় আছে ওরা।

কসাই ঘড়ি দেখল। এই প্রথম কথা বলল সে, 'ভাল কোন খবর থাকলে সাত মিনিটের মধ্যে জানতে পারব...'

'শ্-শ-শ্!' দ্বিতীয় লোকটা আঙুল রাখল ঠোঁটে।

রেডিও থেকে শোঁ-শোঁ করে নতুন একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। তারপরই চিকন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভলিউম বাড়িয়ে দিল কসাই।

'সাত জায়গায় গুলি হয়েছে। মারা গেছে পনেরো থেকে

বাইশজন। আজকের রাত কাল বা পরশুর চেয়ে কম মারাত্মক নয়। কার্গো আনার কোন প্রশ্নই ওঠে না, আপনারাও কেউ এপারে আসবেন না।'

মাউথপীসে ঠোঁট ঠেকিয়ে কসাই জানতে চাইল, 'ছোটভাই, তুমি?'

'আমিও আসছি না।'

'আসল খবরটা বলো, ছোটভাই,' তাগাদা দিল কসাই। 'পালাবদল কি আমাদের...'

রেডিও থেকে জবাব এল, 'না, আমাদের অনুকূলে নয়। কাল দুপুর বারোটার পালা বদল দেখে সিদ্ধান্ত নেব। এবার বোধহয় কার্গো আপনাদের ফিরিয়েই নিয়ে যেতে...' রেডিও ঘর্ঘর করে উঠল।

'এরকম ঘটার কারণ কি?' জানতে চাইল কসাই। 'ওরা আমাদের টাকা খেয়েছে, সেই টাকাও কি ফেরত দেবে না?' রেগেমেগে জানতে চাইল কসাই।

'ঘুষের টাকা কি ফেরত পাওয়া যায়? ধরে নিতে হবে ওটা পানিতে গেছে। তবে ভবিষ্যতে যখন ওদের ডিউটি পড়বে, নতুন করে টাকা দিতে হবে না, কার্গো পার করার সুযোগ...' বাকিটা রানা শুনতে পেল না।

'তুমি তাহলে দুপুরের পর আসছ?'

'না-ও আসতে পারি। আমার তো ক্যান্টনমেন্টে কোন কাজ...'

'কাজ নেই মানে? জেনারেল তোমাকে মাল বুঝিয়ে দিয়েছেন, নেয়ার সময়ও তোমার কাছ থেকে বুঝে নিতে চাইবেন। দেখো, ছোটভাই, আমাদেরকে বিপদে ফেলো না। জেনারেল খেপে গেলে কপালে কিন্তু খারাবি আছে।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আগে দেখি পরবর্তী পালাবদলে কি ঘটে। ছোটভাই ওভার অ্যান্ড আউট।'

রেডিও অফ করে ঠাস করে কপালে চাটি মারল কসাই। 'শালার হিন্দুস্তানী আর্মি বেঈমানী শুরু করেছে!'

'ধ্যাত্, দোষ তো আসলে স্মাগলারদের,' তার সঙ্গী মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল। 'নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসা করতে হলে যাদের ডিউটি পড়বে তাদের সবাইকে ঘুষ দিতে হবে। তা তো ওরা দিচ্ছে না, দিচ্ছে মাত্র একটা গ্রুপকে, কাজেই ভুগতে তো হবেই।'

'এখন মাল নিয়ে ফেরত গেলে জেনারেল মহব্বতজান মা-বাপ তুলে গাল দেবে। আর ওই শালা মেজর আখতার মাসোহারা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেবে।'

'ছোটভাইকে না নিয়ে ফেরা চলবে না,' বলল অপর লোকটা। 'তাহলে ঝড়-ঝাপটা সব ওর ওপর দিয়েই যাবে।'

'আমি শুই, হায়দার। আজকের রাতটা তুমিই ওয়াচে থাকো।'

'ঠিক আছে,' বলে একটা সিগারেট ধরাল হায়দার। 'ধোঁয়াটুকু গিলে, তারপর যাই।'

ওখান থেকে সরে আবার মেইন কেবিনের সামনে চলে এল রানা। লোক তিনজন আগের মতই ঘুমাচ্ছে। তাদেরকে টপকে ভেতরে ঢুকল ও। ওর বাঁ দিকে তিনটে বাঙ্ক, একটার ওপর আরেকটা। ডানদিকে টেবিল, দু'পাশে বেঞ্চ। আরও সামনে একটা দরজা, ভেতরে সম্ভবত টয়লেট। কেবিনে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকবে। স্টোরেজ লকারগুলো অত্যন্ত ছোট। বাঙ্কহেড বরাবর খোলা সবগুলো জায়গা কেবিনের যে-কোন প্রান্ত থেকে দেখা যায়। চোখ নামিয়ে ডেকের দিকে তাকাল রানা। এই কেবিনের নিচে চওড়া জায়গা না থেকে পারে না। আন্দাজ করল হ্যাচটা হবে টয়লেটের কাছাকাছি কোথাও। টেবিল ঘেঁষে সাবধানে এগোল ও। তারপর টয়লেটের দরজা খুলল।

খুব ছোট টয়লেট, নিচে নামার হ্যাচওয়ের মুখ এখানে থাকার

প্রশ্ন ওঠে না। পিছিয়ে কেবিনে ফিরে এল রানা, তীক্ষ্ণ চোখে ডেকে তল্লাশী চালাচ্ছে।

মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে আধখানা চাঁদ। পিছু হটার সময় মাথা নামিয়ে রাখল রানা, আঙুলগুলো হালকাভাবে ডেকের স্পর্শ নিচ্ছে।

সরু ফাটলটা পাওয়া গেল বাঙ্ক আর ওয়াশ বেসিনের মাঝখানে। চৌকো আকৃতিটা হাত দিয়ে অনুভব করল, আঙুল বাধাবার খাঁজ পেয়ে ধীরে ধীরে টান দিয়ে তুলে ফেলল। কব্জা লাগানো হ্যাচ, প্রায় কোন শব্দ না করে উঠে এল। ফাঁকটা তিন বর্গফুট হবে। নিচেটা গাঢ় অন্ধকার। পা গলিয়ে দিয়ে শরীরটা নামাচ্ছে রানা। বুক পর্যন্ত গলে যাবার পর পা ঠেকল তলায়। মাথা নিচু করে হ্যাচটা আবার জায়গামত টেনে দিল ও। লঞ্চের গায়ে হালকা চাপড় মারছে ঢেউ। আর কোন শব্দ নেই। কাল যদি রওনা হয় ওরা, এখানে কিছু রসদ ভরার দরকার হতে পারে। লুকানোর এমন একটা জায়গা বাছতে হবে, নিচে নামলেও কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে লঞ্চের পিছন দিকে এগোল রানা। খালি বস্তার বিরাট একটা স্তূপ ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। ঘুরে ফিরে আসার সময় ভাবল, তাহলে ক্যান্টনমেন্টে ওরা কি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

আর কিছু পাওয়া না গেলে ওই বস্তার আড়ালেই আত্মগোপন করতে হবে ওকে। লঞ্চ দখল করে ক্যান্টনমেন্টে হানা দেয়ার প্ল্যান ইতোমধ্যে সংশোধন করে নিয়েছে রানা। লঞ্চ নিয়ে ওই একই গন্তব্যে যাচ্ছে জঙ্গিরা, কাজেই এখন ওর শুধু লুকিয়ে থাকতে পারলেই হয়।

এবার হ্যাচের সামনের দিকে যাচ্ছে রানা। পাঁচটা বড় আকৃতির কাঠের বাক্স ঠেকল হাতে, রশি দিয়ে বাঁধা। রশি খুলে ওগুলো নতুন করে সাজাতে ঘেমে নেয়ে উঠল ও, এত ভারী।

খালি একটা জায়গা বেরুল পিছনদিকে। আবার ওগুলো বাঁধতে হলো, তা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। বাক্সগুলোর গায়ে লোহার সরু পাত জড়ানো; অন্ধকারে কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা যায়, একটা বাক্সের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করল ও।

খুবই মন্থরগতিতে এগোচ্ছে কাজটা। ইস্পাতের সরু ফিতে ঢিল করার জন্যে ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিচ্ছে রানা, ফলে ঘষাঘষির কর্কশ শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ রানার হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। সব শব্দের উৎস ওর হাত নয়। হাত দুটো স্থির হবার পরও খস খসে আওয়াজ পাচ্ছে রানা। অতি ছোট পায়ে কি সব যেন লাফাচ্ছে ওর সামনে।

ইঁদুর! রানার শিরদাঁড়ার ভেতর বিচিত্র অনুভূতি।

বাক্সগুলো সাজাবার পর, ওগুলোর ওপর দিয়ে ক্রল করে পিছনের ফাঁকা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে রানা। ওর তিনদিকে বাক্সের পাঁচিল, সেই পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করছে অভুক্ত, রোগজর্জরিত, নোংরা একদল ইঁদুর। সংখ্যায় ক'টা, একেকটা কত বড়, ওর কোন ধারণা নেই। কার্গো হোল্ডের ইঁদুর কি ভয়ানক হিংস্র আর বিপজ্জনক হয়, শুনেছে রানা। সুযোগ পেলে জ্যান্ত মানুষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।

ব্যাগ হাতড়ে লাইটার বের করল রানা। সেটা জ্বালতেই ধাঁধিয়ে গেল চোখ। তারপর দেখতে পেল–একজোড়া এরই মধ্যে বাক্সের মাথায় উঠে পড়েছে।

সারা শরীর রি-রি করে উঠল রানার। আকারে ওগুলো নধর বিড়ালছানার মত। সরু নাকে গোঁফের লম্বা রোঁয়াগুলো এদিক ওদিক কাঁপছে। কালো, ক্ষুধার্ত, চোখগুলো লাইটারের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। অতিরিক্ত গরম হয়ে ওঠায় হাত থেকে ডেকে খসে পড়ল লাইটার, নিভেও গেল। রানা অনুভব করল কোলের ওপর নরম কি যেন একটা পড়ল। অন্ধকারেই ছুরি চালাল, দাঁতে লেগে শব্দ করল ফলা। ইঁদুরটা এবার ওর দু'পায়ের মাঝখানে

ঢুকে পড়েছে। ওটার গায়ে ছুরির ফলা গাঁথার চেষ্টা করছে, সেই সঙ্গে খালি হাত দিয়ে লাইটারটা খুঁজছে। ওর ট্রাউজারের পায়া ধরে টান দিল কে যেন। লাইটার পেয়েই জ্বালল ও। ট্রাউজার কামড়ে ধরে দ্রুত ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে ইঁদুরটা। ছুরির ফলা বারবার নামিয়ে এনে দু'বার মাত্র বিদ্ধ করতে পারল রানা। ট্রাউজার ছেড়ে দিয়ে ছুরির ফলাটায় কামড় দিতে চেষ্টা করল ওটা। এবার রানা ছুরিটা পেটে গাঁথতে পারল, শূন্যে তুলে ঠেলে দিল দ্বিতীয় ইঁদুরটার দিকে, বাক্সের মাথা থেকে ওর ওপর লাফিয়ে পড়ার পাঁয়তারা কষছিল। দুটো ইঁদুরই বাক্সের মাথা থেকে উল্টোদিকে নেমে গেল। কিন্তু রানা জানে আবার ফিরে আসবে ওগুলো।

পরের বার আরও মরিয়া হয়ে হামলা চালাল ওগুলো। শুধু ছুরি দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়, প্রথমে রুমালে, তারপর চটে আগুন ধরিয়ে ছ্যাঁকা দিল রানা। পালিয়ে যায়, কিন্তু খানিক বাদেই ফিরে আসে আবার। এই ভাবে চলল সারা রাত, তারপর এক সময় সকাল হয়ে গেল, হ্যাচওয়ের ফাটল দিয়ে দেখা দিল ভোরের আলো।

সারারাত জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা, বসে বসে ঝিমাচ্ছে। সকাল দশটার দিকে খেয়াল করল ইস্পাতের সরু ফিতেটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। আরেকটু চেষ্টা করতেই বাক্সের ডালা খুলতে পারল। ভেতরে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল রানার। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। পাকিস্তানী জঙ্গিরা লঞ্চে করে অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে এসেছিল নদীর ওপারে পাচার করার জন্যে। খোলা বাক্সটা কানায় কানায় গ্রেনেডে ভর্তি। বাকি চারটে বাক্সে সম্ভবত রাইফেল আর অ্যামুনিশন আছে।

দুপুর বারোটার পর থেকে ডেকে চলাফেরার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। দেড়টার সময় লঞ্চের গায়ে একটা এঞ্জিনচালিত বোট ভিড়ল। বিশ মিনিট পর হঠাৎ খুলে গেল হ্যাচ, রানার লুকানোর জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল। আশপাশেই ছিল, একযোগে ছুটে

পালাল ইঁদুরগুলো। গুমোট ভাবটা কেটে যাচ্ছে, তাজা বাতাস ঢুকছে ভেতরে।

'তাড়াতাড়ি করুন,' চিকন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ডেক থেকে। 'সন্ধ্যার আগেই রওনা দিতে হবে।'

সন্দেহ হলো এ নিশ্চয়ই সেই কাশ্মীরী তরুণ শাহীনের গলা।

হ্যাচ গলে দু'জন লোককে নামতে দেখল রানা। একজন দাঁড়াল ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। দ্বিতীয় লোকটা সরাসরি হ্যাচের নিচে। ডেক থেকে কেউ একজন কাঠের বাক্স ধরিয়ে দিচ্ছে তার হাতে।

ছোট আকৃতির বাক্সগুলো, হ্যাচের কাছাকাছি সাজিয়ে রাখল ওরা। বড় বাক্সগুলো ভেতর দিকে টেনে আনা হলো। কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল বাক্সগুলোয় ভারতীয় শাল, শাড়ি, ওষুধ আর ফেনসিডিল আছে–এ-সবই পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের ভেট দেয়া হবে।

কসাইয়ের গলাও পেল রানা, ডেকে দাঁড়িয়ে শাহীনের সঙ্গে আলাপ করছে। ওদের সব কথার অর্থ ধরতে না পারলেও, একটা কথা পরিষ্কার বুঝল রানা–এম.ভি. চেনাব একটানা দশদিন এ-পারে নোঙর ফেলে থাকায় ওপারে ওদের মনে সন্দেহ জেগেছে, তাই লঞ্চের নাম ও রঙ পাল্টানো দরকার। ব্যাপারটা জরুরী এই কারণে যে বুধবারে এই লঞ্চ নিয়েই ওপারে যাবে জঙ্গিরা, একজন মেহমানকে ভারত থেকে তুলে পাকিস্তানে আনতে হবে।

লোকগুলো হ্যাচ বন্ধ করে চলে যাবার আধ ঘণ্টা পর নোঙর তুলে রওনা হলো এম.ভি. চেনাব। বিশ-বাইশ মাইল দূরে নদীর ধারেই ছোট্ট এক শহর আছে, ম্যাপে উল্লেখ না থাকলেও ওই শহরের কাছাকাছি পাকিস্তানী সৈন্যদের বড়সড় একটা ক্যাম্প থাকার কথা। এই নদী ধরে গেলে একটা গ্যারিসন পাওয়া যাবে প্রায় ষাট মাইল দূরে ওয়াজিরাবাদের কাছে। রানার সন্দেহ, এই গ্যারিসনটাকেই সম্ভবত ক্যান্টনমেন্ট বলা হচ্ছে। আবার এমনও

হতে পারে, গ্যারিসনটাকে ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

ছোট্ট একটা জায়গায় কতক্ষণ বসে থাকা যায়, রানা জানে হাত-পা খেলাবার জন্যে এবার ওকে বাক্সগুলোর আড়াল থেকে বেরুতে হবে। নতুন বাক্সগুলো থেকে বেরিয়ে আসা ফল পাকড়ের গন্ধ খালি পেটটাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। প্রায় এক ঘণ্টা হলো ইঁদুরগুলোর বাক্স আঁচড়ানোর আওয়াজ পাচ্ছে ও। কিন্তু নতুন বাক্সগুলো ভারী শক্ত, দাঁত বসানো সম্ভব না হওয়ায় ঝাঁকটা জ্যান্ত খাবার পাবার লোভে আবার ওর কাছে ফিরে আসছে।

শব্দ শুনে টের পাচ্ছে রানা, বাক্স বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে ওগুলো। আওয়াজই বলে দিচ্ছে কতটা ওপরে উঠতে পারছে। অসময়ে লাইটার জ্বেলে জ্বালানি অপব্যয় করতে রাজি নয় ও। কান পেতে আছে রানা। টের পেল একটা ইঁদুর বাক্সের মাথায় উঠে বসেছে। তারপর আরেকটা। এক হাতে লাইটার, অপর হাতে ছুরি। লাইটার জ্বালার পর উপলব্ধি করল, অঙ্কে ফেল করেছে। পাঁচটা ইঁদুর ছুটোছুটি করছে বাক্সের মাথায়, আরও দুটো যোগ দিলো। ভয়ে শুকিয়ে গেল বুকটা। একটা ইঁদুর অন্যগুলোর চেয়ে সাহসী হয়ে উঠবে। দেখাদেখি বাকিগুলো হামলা করবে। আর একবার হামলা শুরু হলে ওগুলোর বিষদাঁতের কামড় থেকে বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।

একটা ইঁদুর সামনে বাড়ল, পা দুটো বাক্সের কিনারা ছুঁই ছুঁই করছে। গোঁফশোভিত সরু নাকে লাইটারের ছ্যাকা মারার ভঙ্গি করল রানা, পরমুহূর্তে ছুরি চালাল সামনের দিকে। সরাসরি চোখে ঢুকল ফলার চোখা প্রান্ত। ঝাঁকি খেলো ইঁদুরটা, ছিটকে বাক্স থেকে পিছন দিকের মেঝেতে পড়ে গেল। বাকি ইঁদুরগুলো ভয়ে নয়; লাফ দিয়ে পড়ল রক্তের গন্ধে; আহত সঙ্গীকে এখন তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ফুয়েল শেষ, রানার হাতে নিভে গেল লাইটার। আগুন না

থাকায় রানার ডিফেন্স এখন ভেঙে পড়তে বাধ্য। দেখতে না পেলে কার গায়ে ছুরি গাঁথবে ও? সঙ্গীকে খেয়ে ওদের পেট ভরবে না, খিদেটা বরং আরও চেগিয়ে উঠবে। তখন আবার ফিরে আসবে ওরা।

বাক্স ধরে দাঁড়াল রানা। অনুভব করল, এতক্ষণ নিজের ঘামের ভিতর বসে ছিল। ভালভাবে রক্ত চলাচল শুরু হওয়ার পর বাক্সগুলোর মাথা টপকে নেমে এল ও।

ছুরির ফলা দিয়ে চাড় দিতেই নতুন বাক্সের ডালা খুলে গেল। ভেতরে হাত গলিয়ে পেঁপে, কলা, আঙুর আর আপেল পেল রানা। চারদিকে বেশ কিছু ফল ছড়িয়ে দিল ও। আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, মুষিককুলে মচ্ছব শুরু হয়ে গেছে। নিজেও ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে গোগ্রাসে গিলল রানা।

ওই সময় হ্যাচ খোলার আওয়াজ হলো। তাড়াতাড়ি সরে এসে নিজের লুকানোর জায়গায় ঢুকে পড়ল রানা। এবার মাত্র একজন লোক নামল, দ্বিতীয় লোকটা খোলা মুখ থেকে টর্চের আলো ধরে আছে। 'শুধু কলা আর আপেল, আর কিছু না,' ডেক থেকে বলল সে। গলাটা চিনতে পারল রানা। এ সেই কসাই।

'সর্বনাশ!' নিচে নেমেই আঁতকে উঠল লোকটা। 'বাক্স ভাঙা কেন? ইয়া আল্লাহ! ইঁদুর!'

'ইঁদুর? নাকি কেউ ঢুকে বসে আছে?' হ্যাচের মুখ থেকে জানতে চাইল কসাই। 'গব্বর সিং কি মেসেজ পাঠিয়েছে, শোনোনি?'

'আরে না, ইঁদুরই...গব্বর সিং আবার কি মেসেজ পাঠাল?'

'ওই শালা বেজন্মা বোঙ্গালী খুনীটা বিজ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে ব্যাটা এসপিওনাজ এজেন্ট—মাসুদ রানা। শুনেছি সে নাকি এককালে পাকিস্তানের জবরদস্ত স্পাই ছিল। রিয়াসিতে নেই সে, প্রফেসর হাসানকে বলে এসেছে তার বউ-বাচ্চাকে উদ্ধার করতে যাবে...'

'হাহ্, এতই যদি সহজ হত...'

'তবু, জায়গাটা ভাল করে সার্চ করো। সাবধানের মার নেই...'

'মাফ করো, লিয়াকত ভাই,' নিচে থেকে বলল লোকটা। 'একেকটা বিড়ালের সাইজ, কায়দা মত পেলে ছিঁড়ে তুলে নেবে এক খাবলা গোস্ত। সার্চ করাতে হলে তুমি ভাই আর কাউকে ডাকো।' এক ছড়া কলা আর কিছু আঙুর নিয়ে ডেকে উঠে পড়ল লোকটা। হ্যাচ বন্ধ হবার আগে রানা শুনতে পেল রাগে গজ গজ করছে কসাই ওরফে লিয়াকত।

সার্চ করতে হোক বা ইঁদুর মারতে, আবার ওরা ফিরে আসবে, জানে রানা। তবে ধরা পড়ার আশঙ্কায় যতটা ভয় পাচ্ছে, তারচেয়ে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছে ওর পরিচয় ও উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায়। ওর আসলে প্রফেসরের কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেয়া উচিত হয়নি। স্যুইটের ছোট্ট কিচেনেও মাইক্রোফোন ছিল, সার্চ করলে ঠিকই পেয়ে যেত ও। নিজের ওপর রাগ হলো রানার। ওর যা পেশা, এ-ধরনের জঘন্য ভুল ওকে অন্তত সাজে না।

এগারো

লোকটা এল সকালে। হ্যাচ খুলতেই হোল্ডের ভেতর দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল। একজন মাত্র লোক, দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল রানা। এরমানে কসাই লিয়াকত নিজেও বিশ্বাস করে

না তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মাসুদ রানা লঞ্চের হোল্ডে ঢুকে বসে আছে। লোকটাকে সে পাঠিয়েছে ইঁদুর মারার জন্যে।

তার এক হাতে একটা ম্যাচেটি, অপর হাতে টর্চ দেখতে পাচ্ছে রানা। মাথা নিচু করে কাঠের খোলা বাক্সটার দিকে এগোল সে। টর্চের আলোয় একজোড়া ইঁদুর ধরা পড়ল। ওগুলোর পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলো, ম্যাচেটির দ্রুতগতির দুই কোপে দুটোকেই দু'টুকরো করে ফেলল লোকটা। চারদিকে তাকিয়ে আরও ইঁদুর খুঁজল সে। তারপর মেঝে থেকে কুড়িয়ে আপেল আর কলা বাক্সে ভরে রাখল। মেঝেটা পরিষ্কার করার পর ডালাটা তুলে বাক্সের মাথায় বসাতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হাত দুটো।

ডালার কিনারায় আঙুল বোলাল লোকটা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দ্বিখণ্ডিত ইঁদুর দুটোর দিকে তাকাল সে। বুঝতে পারছে, বাক্সের ডালা ইঁদুর খোলেনি, ধারাল ফলার দাগ অন্য কথা বলছে। চারদিকে টর্চের আলো ফেলল লোকটা এবার, হাতের ম্যাচেটি বাগিয়ে ধরেছে, সতর্ক, কাউকে দেখামাত্র আঘাত করবে।

নতুন বাক্সগুলোর চারপাশে তল্লাশী চালাবার পর আর্মস-অ্যামিউনিশনের দিকে এগোল লোকটা। সাজানো দশটা বাক্সের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। সম্ভবত স্মরণ করার চেষ্টা করছে, ঠিক এভাবেই রেখে গিয়েছিল কিনা।

হাত বাড়িয়ে রশির গিঁট খুলছে লোকটা।

হাতে ছুরি নিয়ে রানাও তৈরি হয়ে আছে বাক্সগুলোর পিছনে।

রশি খোলার পর ওপরের বাক্সটা টেনে নামাল লোকটা। রানাকে দেখে তার ভুরু জোড়া চুলের প্রান্তে উঠে গেল। পরমুহূর্তে গগনবিদারী চিৎকার বেরিয়ে এল গলা থেকে, 'ইয়া আলী!' ম্যাচেটি তুলল সে, রানার কাঁধ লক্ষ্য করে নামিয়ে আনবে।

বিদ্যুৎ বেগে সামনে ঝুঁকল রানা, ঘ্যাচ করে ছুরির লম্বা ফলা ঢুকিয়ে দিল লোকটার গলায়, একেবারে সেই হাতল পর্যন্ত,

তারপর টান দিল একপাশে। মুখভরা রক্ত, কুলকুচো করার আওয়াজ বেরুচ্ছে। টর্চ আর ম্যাচেটি, দুটোই খসে পড়ল হাত থেকে, হাঁ করা মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

বাক্সগুলোর ওপর উঠে পড়ল রানা। লঞ্চ একদিকে কাত হলো। ওকে নিয়ে ঢলে পড়ল সবগুলো বাক্স, ছিটকে বাল্কহেডের গায়ে ধাক্কা খেলো ও। মুখ তুলে তাকাতে হ্যাচের খোলা মুখে সেই সুদর্শন তরুণকে দেখতে পেল রানা, ওর দিকে তাক করে ধরে আছে ছোট একটা পিস্তল। তার পাশ থেকে কসাই লিয়াকত নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'সালা বোঙ্গালী স্পাই, দেখি এখন তোকে কে বাঁচায়! উঠে আয় বানচোত!'

পায়ের অসাড় ভারটা পুরোপুরি কাটতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। আফটার ডেকে পায়চারি করছে রানা, মাঝেমধ্যে বড় করে শ্বাস টেনে তাজা বাতাস ভরছে বুকে; ওর প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করছে মুক্তিযোদ্ধা শাহীনের ছোট্ট অটোমেটিক। দু'পা ফাঁক করে শাহীনের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লিয়াকত, হাতে আর্মি .৪৫। রানার হাতঘড়িতে সকাল এখন দশটা।

কিছুক্ষণ আগে লিয়াকতের সহকারী জঙ্গিরা হ্যাচ থেকে তাদের সঙ্গীর লাশ তুলে ঢেকে রেখেছিল। লাশটা কি করা হবে, এ নিয়ে খানিকটা তর্ক হয়েছে। লিয়াকত বাদে বাকি জঙ্গিদের বক্তব্য ছিল, মার্সেনারি হলেও, সে-ও তো কারও স্বামী বা সন্তান, কাজেই ক্ষতিপূরণের টাকার সঙ্গে লাশ ফিরে পাবার অধিকার আছে তার পরিবারের। আর লিয়াকত বলল, ভাড়াটে জঙ্গিরা কেউ মারা যাক বা নিখোঁজ হোক, ক্ষতিপূরণের টাকা একই থাকবে। কিন্তু কেউ যদি নিখোঁজ হয়, সেজন্যে লীডারকে জবাবদিহি করতে হয় না। যত ঝামেলা কেবল নিহত হলে। মেজর, কর্নেল, জেনারেল—সবাই রিপোর্ট চাইবেন, তারপর শুরু হবে দিনের পর দিন ইন্টারোগেশন। কাজেই এত সব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে

লাশ নদীতে ফেলে দেয়াই সবদিক থেকে ভাল। লিয়াকতই ওদের লীডার, কাজেই শেষ পর্যন্ত তার যুক্তিই মেনে নিতে হলো সবাইকে। লাশটা ওরা ধরাধরি করে ফেলে দিল পানিতে। রানা লক্ষ করল, ওদের আলোচনায় শাহীন অংশগ্রহণ করেনি।

পায়চারি থামিয়ে শাহীনের দিকে তাকাল রানা। 'হাত মুখ ধুয়ে দাড়ি কামাতে চাই আমি।'

কথা না বলে লিয়াকতের দিকে তাকাল শাহীন।

কর্কশ গলায় লিয়াকত বলল, 'আমার এক কথা–খুনের বদলে খুন।'

'বড়ভাই, আপনাকে ব্যাপারটা আরেকবার চিন্তা করে দেখতে বলি,' নরম সুরে বলল শাহীন। 'গব্বর সিং-এর মেসেজ যদি নির্ভুল হয়, এই মাসুদ রানা বাংলাদেশের টপমোস্ট স্পাই। হিন্দুস্তান আর বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত যত রকম ষড়যন্ত্র করেছে এবং এখনও যে-সব ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, সব কথা ওর জানা। মেজর জেনারেল মহব্বতজান অবশ্যই ওকে আইএসআই-এর হাতে তুলে দেবেন, তারা ইসলামাবাদে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেট করবেন ওকে, বেরিয়ে আসবে অনেক গোপনীয় তথ্য। কিন্তু আপনি যদি এখুনি ওকে মেরে ফেলেন...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল সে।

'খুনের বদলা খুন!' লিয়াকতের পিছন থেকে আরেক জঙ্গি ঘোষণা করল। শাহীন

'আরও একটা ব্যাপার আপনাদেরকে ভেবে দেখতে বলি আমি,' বলল শাহীন। 'ও যদি সত্যি মাসুদ রানা হয়, আপনারা প্রত্যেকে মোটা অঙ্কের টাকা পেতে যাচ্ছেন। আমি শুনেছি, আইএসআই এক বছর আগে ঘোষণা করেছিল, মাসুদ রানাকে জীবিত ধরে দিতে পারলে দুই কোটি টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।'

জঙ্গিরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ওদের মধ্যে দু'জন আবার বলল, 'খুনকা বদলা খুন!' তবে গলায় এবার তেমন

জোর নেই।

'আপনি কিছু খাবেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল শাহীন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ইঙ্গিতে মেইন কেবিনটা দেখিয়ে আবার বলল, 'যান, মুখ-হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নিন। আমরা তো আপনাকে এরকম যাচ্ছেতাই চেহারা নিয়ে জেনারেলের সামনে হাজির করতে পারব না।'

বেসিনে দাঁড়িয়ে মুখ-হাত ধুলো রানা। পিছনে জঙ্গিরা দাঁড়িয়ে আছে, সবার অস্ত্র ওর দিকে তাক করা।

রানার পিস্তল আর ছুরিটা টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। লিয়াকতের ইঙ্গিতে ওগুলো সরিয়ে ফেলা হলো।

রুটি, মাংস আর ফল খেতে দেয়া হলো রানাকে। শাহীন তখনও টেবিলে সাজানো শেষ করেনি, খালি হাতের আকস্মিক ঝাপটায় সমস্ত খাবার ফেলে দিল লিয়াকত। তার পিস্তল রানার দিকে তাক করা। বাকি জঙ্গিরা লীডারকে কাভার দিচ্ছে।

শাহীনের দিকে ফিরে হিসহিস করে উঠল লিয়াকত। 'কে বলবে কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের হিরো তুমি? একটু আগে আমাদের এক সাথীকে যে-লোক খুন করেছে, গতকাল খুন করেছে আরও তিনজনকে, সেই লোকের প্রতি তোমার এই দরদ...এর মানে কি? তোমাকে ঠিক একটা ছিনাল মাগী মনে হচ্ছে। হায়দ্রাবাদের বেশ্যারাও কোন খদ্দেরকে এত খাতির করে না।' ঘাড় ফিরিয়ে জঙ্গিদের ইঙ্গিত করল সে।

দু'জন জঙ্গি এগিয়ে এসে ধরল রানাকে, ঠেলে বাঙ্কের কাছে নিয়ে এল। প্রথমে ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল তারা, সেই রশিরই একটা প্রান্ত বাঙ্কের পায়ায় জড়িয়ে শক্ত করে গিঁট দিল।

'খাবার ও পানি বন্ধ। ওর সঙ্গে কেউ কথাও বলবে না,' হুকুম জারি করল লিয়াকত। 'তোমরা কেবিনের বাইরে পাহারায় থাকো,' দু'জন জঙ্গিকে বলল সে, তারপর ফোঁস ফোঁস করে

নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

শাহীন একটা কথাও বলল না। মেঝে থেকে নষ্ট খাবারগুলো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে-ও। যাবার আগে রানার দিকে একবার তাকালও না।

জঙ্গিরা কেবিনে না ঢুকলেও, বাইরে থেকে সারাক্ষণ নজর রাখছে রানার ওপর। বাঙ্কের পাশে সারাটা দিন একাই বসে থাকল ও, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। খোলা ডেকে মাঝেমধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল শাহীনকে, ভুলেও একবার কেবিন বা রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

সময়ের হিসাবে অনেক আগেই ছোট্ট শহরটাকে পিছনে ফেলে এসেছে লঞ্চ। কেবিনের ভেতর থেকে নদীর দু'পাশে রুক্ষ পাহাড় দেখতে পাচ্ছে রানা। মাঝেমধ্যে দু'একটা পাল তোলা নৌকা ও লঞ্চকে পাশ কাটাতে দেখা গেল। সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ের গায়ে পাকিস্তানী ক্যাম্পও চোখে পড়ল। রানা আন্দাজ করল, রাতে যদি না-ও হয়, সকালের দিকে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। ক্যান্টনমেন্ট হোক বা গ্যারিসন, অন্তত আশা করতে দোষ নেই যে এখানেই আটকে রাখা হয়েছে মিসেস হাসান আর নেহালকে। কাল সকাল মানে রোববার। অর্থাৎ ওদেরকে উদ্ধার করে ভারতে নিয়ে যাবার জন্যে রানা সময় পাবে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি।

সময়ের একটা হিসাব অবশ্য রানা মেলাতে পারল না। ওরা বলেছে, রঙ ও নাম পাল্টে এম.ভি. চেনাবকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নাওয়ানশাহরে। কিন্তু বুধবারের মধ্যে ফিরতে হলে অত সময় কি পাবে তারা?

হাত বাঁধা হলেও, দীর্ঘ নিরুপদ্রব সময়টা দুশ্চিন্তায় না কাটিয়ে সদ্ব্যবহার করল রানা ঘুমিয়ে। শেষবার ঘুম ভাঙার পর দেখল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নদীর পাশে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত। একটু খেয়াল করতে বিস্মিত রানা

দেখল, গ্রামের ঘরগুলো আসলে সৈনিকদের ক্যামোফ্লেজড আস্তানা। দেখে মনে হচ্ছে মাটির ঘর, আসলে তা নয়; কংক্রিটের ওপর মেটে রঙ চড়ানো হয়েছে, ছাদ ঢেকে ফেলা হয়েছে লতানো গাছের শাখা-প্রশাখা দিয়ে। প্রায় প্রতিটি ঘরের ছাদে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের ব্যারেল দেখতে পেল রানা, আকাশের দিকে মুখ করে আছে। গ্রামগুলোর প্রতিটি রাস্তা পাকা। এর একটাই অর্থ—গ্যারিসন নয়, ওদের গন্তব্য নতুন গড়ে তোলা কোনও ক্যান্টনমেন্টই, এবং বিশাল একটা এলাকা জুড়ে সেটার বিস্তৃতি।

তারপর আবার রানার চোখে ঘুম চলে এল।

এবার ঘুম ভাঙল কারও আলতো স্পর্শে। চোখ মেলার আগে কি ঘটছে বুঝতে চাইল রানা। কে যেন ওর মুখের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। আশ্চর্য একটা গন্ধ পাচ্ছে রানা, অতি পরিচিত মনে হলেও ঠিক চিনতে পারছে না। ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করল সে, যেন চুপিচুপি ওকে জাগাবার চেষ্টা করছে।

ইচ্ছে করেই সাড়া দিচ্ছে না রানা।

ওর কাঁধে হাত পড়ল এবার। মৃদু ঝাঁকি দিল। তারপর আঙুল বুলাল ওর গালে।

'কে?' নড়ে উঠল রানা।

'সেই থেকে ঘুমাচ্ছেন, আপনার খিদে পায়নি?' ফিসফিস করল শাহীন। 'আমি আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

নড়েচড়ে যতটা সম্ভব সিধে হয়ে বসল রানা। 'ওরা জানে?'

'জানুক, আমি কেয়ার করি না,' বলল শাহীন। 'হায়দারকে বলে এসেছি, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে জেনারেল মহব্বতজানের কাছে অভিযোগ করব আমি।'

'লিয়াকত কোথায়?'

'পাশের কেবিনে ঘুমাচ্ছে,' বলল শাহীন। ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে রানার মুখ মুছিয়ে দিল সে।

'কিছু মনে কোরো না, একটা প্রশ্ন করি,' বলল রানা। 'আমার

জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। কেন?'

রুমাল দিয়ে রানার মুখটা মুছে দিল শাহীন। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'হাঁ করুন।' ওর মুখে একটুকরো আপেল গুঁজে দিল সে। রানা লক্ষ করল, থেমে আছে ওদের বোট।

খালি পেটে অতি দ্রুত চালান হয়ে গেল একজোড়া আপেল, একজোড়া সাগরকলা আর এক থোকা আঙুর। কেবিনটা অন্ধকার। রানার মুখ মুছিয়ে দিল শাহীন, আবার তার গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা। সেই আশ্চর্য গন্ধটাও পেল; কিন্তু চিনতে পারল না। কিছু দেখতে না পেলেও, শুনতে না পেলেও, প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলল, ছেলেটা কাঁদছে নিঃশব্দে।

'কে তুমি?' নিজের অজান্তেই রানার অন্তর থেকে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা।

'এই মরণের পথে কেন আপনি এলেন?' ফিসফিস করল শাহীন।

রানার জবাব হলো সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথাযথ, 'আমি একটা দায়িত্ব পালন করছি, শাহীন।'

'আমি চাই না আপনি আমাকে ভুল বোঝেন,' বলল শাহীন। 'আপনার পক্ষে কথা বলছি, বারবার আপনার কাছে ছুটে আসছি, এ-সব দেখে ভাববেন না আমি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারব। আমি ছোট মানুষ। তাছাড়া, এটা আমার এলাকাও নয়।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'সব মিলিয়ে তিনটে দল তোমরা—কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধা, ভাড়াটে জঙ্গি, আর পাকিস্তানী আর্মি। দুই পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখতে হয় তোমার, কারণ ওদের সাহায্য ছাড়া গেরিলাযুদ্ধ চালানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভাল কথা, আমার একটা তথ্য দরকার, জানা থাকলে বলবে?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শাহীন বলল, 'আপনি আমার কাছে কোন সাহায্য না চাইলেই আমি খুশি হব। এখন কথা থাক। আপনার জন্যে এনেছি, রাখুন এগুলো।' রানার হাতে এক

প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই ধরিয়ে দিল।

রানা উপলব্ধি করল, ফুলের মত কোমল একটা মন আছে এই ছেলেটার, কিন্তু একই সঙ্গে চরিত্রে দৃঢ়তারও কোন অভাব নেই: কারও সঙ্গে নেমকহারামি করতে রাজি নয়। একটু পর ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'ওই যা! আপনার জন্যে স্টোভে কফি চড়িয়ে রেখে এসেছি!' বলে দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল শাহীন।

ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর, রীতিমত একটা রহস্য। কিন্তু বন্দী মাসুদ রানাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে একই সঙ্গে আত্মরক্ষা ও জিম্মি উদ্ধারের সমস্যা নিয়ে, কাজেই শাহীন রহস্য যথাযোগ্য মনোযোগ পেল না। শাহীন কফি নিয়ে ফিরে এলে কি করতে হবে ঠিক করে ফেলল ও। সাহায্য চেয়ে লাভ নেই, কাজেই কৌশলে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

গরম কফি, একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে রানা। শাহীন খুব সাবধানে ধরে আছে কাপটা। কাপ খালি হতে রানা বলল, 'ব্লাডারের অবস্থা কি আর বলব, যখন তখন ফেটে যেতে পারে। আমি একবার টয়লেট থেকে ঘুরে আসতে পারি?'

অন্ধকারে আড়ষ্ট হয়ে গেল শাহীন। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছেন?'

'মিথ্যে বলে আমার কোন লাভ আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আমি কি এই লঞ্চ থেকে পালাতে পারব? তাছাড়া, এই সামরিক এলাকায় পালাবই বা কোথায়?'

কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল শাহীন। বাইরে টহল দিচ্ছিল দুই জঙ্গি, একটু পর কেবিনে ঢুকে রানার বাঁধন পরীক্ষা করল তারা। অ্যালুমিনিয়ামের একটা পাত্র দিয়ে গেল শাহীন। বাধ্য হয়ে ওই পাত্রেই ব্লাডার খালি করতে হলো রানাকে। জঙ্গিরা আগেই চলে গেছে। আবার ফিরে এসে পাত্রটা নিয়ে গেল শাহীন। হতাশ রানা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল।

কৌশলটা কাজে লাগেনি।

সারারাতে বেশ কয়েকবার পালা করে ওর বাঁধন পরীক্ষা করে গেল জঙ্গিরা। রানার মাথার ওপর একটা বাঙ্কে শুয়েছে শাহীন। তবে সাবধানের মার নেই ভেবে নিজের ছোট্ট পিস্তলটা কেবিনের বাইরে কোথাও রেখে এসেছে সে, আলাপের এক ফাঁকে কথাটা সে জানিয়েও দিয়েছে রানাকে।

দিনে ঘুমিয়েছে, কাজেই রাত জাগতে রানার কোন অসুবিধে হলো না। তবে অবাক হলো ওর সঙ্গে শাহীনকেও জেগে থাকতে দেখে। রানা একটু নড়াচড়া করলেই জানতে চাইল, ওর কি কিছু লাগবে? পানি খাবে? সিগারেট দরকার?

'আমরা থেমে আছি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই এলাকায় রাতে বোট চলে না।' সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তুমি ঘুমাচ্ছ না কেন?' এক সময় জানতে চাইল রানা।

চাপা গলায় হেসে উঠল ছেলেটা, তারপর বলল, 'এরকম চাঁদনি রাতে কেউ ঘুমাতে পারে? দেখছেন না, কেমন ভিজিয়ে দিচ্ছে!'

শাহীনের কথায় হেসে ফেলল রানাও। কথাটা সে মিথ্যে বা বাড়িয়ে বলেনি। আধখানা হলে কি হবে, আজ রাতের চাঁদটা বড় বেশি উজ্জ্বল, তার ঠাণ্ডা-কোমল আলো সত্যি সত্যি যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে।

'বাড়িতে কে কে আছে আপনার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'আমার ঘর শূন্য,' কৌতুক করে বলল, কিন্তু কোত্থেকে যেন বিষাদের সুর এসে ভর করল গলায়, কথাটা নিজের কানেই শোনাল হাহাকার ধ্বনির মত।

'আপনি ফিরে না গেলে বুক চাপড়ে কাঁদবে না কেউ? মাতম করবে না? এমন কেউ নেই, আপনি না থাকলে তার বেঁচে থাকাটাও অর্থহীন হয়ে যাবে?'

অন্তরের গহীনে ডুব দিল রানা। ব্যাকুল ব্যস্ততার সঙ্গে খুঁজছে। অনেককেই পাওয়া গেল—ওকে তারা ভালবাসে, ওর মৃত্যুতে কষ্ট পাবে, চোখের পানিও ফেলবে, কিন্তু ও না থাকলে তাদের কারও জীবনই অর্থহীন হয়ে যাবে না।

সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ রহস্যময় এক ভিনদেশী তরুণ আজ সহজ-স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন তুলে নির্মম অথচ বাস্তব এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল মাসুদ রানাকে।

এমন ভাল কেউ ওকে বাসে না, ওর অবর্তমানে যার জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে।

একই সঙ্গে এই উপলব্ধিও হলো, সেটা আরও তিক্ত, আরও হৃদয়বিদারক—সে-ও এমন করে কাউকে কোনদিন ভালবাসেনি যার অবর্তমানে মনে হবে ওর জীবনটা থেমে গেছে।

'না।'

বাঙ্কের ওপর ছেলেটা যেন আঁতকে উঠল। 'কেন এমন হলো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে, তারপর একটা হাত রাখল রানার কাঁধে।

হাতটা সরিয়ে দিতে যাবে, রানা অনুভব করল ছেলেটা ওর মুখের কাছে ঝুঁকে-পড়েছে। সেই গন্ধটা আবার পেল ও, এবং এবার আর চিনতে ভুল হলো না। কী আশ্চর্য! এ-ও কি সম্ভব?

তার একটা হাত শক্ত করে ধরল রানা। কিছু বলতে যাবে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে। 'শ্-শ্-শ্!' হিসহিস করল সে। 'যদি বুঝে থাকেন, কাউকে বলবেন না, প্লীজ! আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।'

বারো

সকালে কেবিন থেকে বের করে খোলা ডেকে আনা হলো রানাকে, নতুন করে ডেক রেইলিঙের সঙ্গে বাঁধা হলো পিছমোড়া করা হাত দুটো। লিয়াকত মনের সাধ মিটিয়ে কয়েকটা লাথি মারল ওকে, বলল, 'প্রথমে মেজর আখতার তোমার ছাল তুলুক, তারপর আমি তোমার নাড়িভুঁড়ি বের করব। শুধু ছোটভাই বাধা দেয়ায় তুমি এখনও বেঁচে আছ, কিন্তু আর কতক্ষণ?'

লাথি খেয়ে রানার ঠোঁট ফেটে গেছে, রক্ত পড়ছে টপ টপ করে। লিয়াকত সামনে থেকে সরে গেল। ওকে পাহারা দিচ্ছে হায়দার আর শওকত নামে দুই জঙ্গি। ডেক থেকে রানা কোথাও শাহীনকে দেখতে পেল না। হয়তো রাত জাগার পর এখন সে ঘুমাচ্ছে।

আবার চলছে লঞ্চ। চেনাব নদী এদিকে দুপাশেই বেশ কয়েকটা শাখা বিস্তার করেছে, বেশিরভাগই সরু খাল। দূরে দূরে পাহাড় দেখা গেলেও, নিচু এলাকায় ধান চাষ হতে দেখে একটু অবাক হলো রানা। নদীতে প্রচুর নৌকা রয়েছে, মাঝেমধ্যে দু'একটা লঞ্চও দেখা যাচ্ছে। স্পীডবোটগুলো সবই আর্মির, সৈনিক নিয়ে আসা-যাওয়া করছে। একটা পেট্রলবোট ওদের লঞ্চকে ওভারটেক করল।

বেলা দুটোর দিকে ক্যান্টনমেন্টের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছাল লঞ্চ। ডকের বিভিন্ন পজিশনে মর্টার, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট

গান ও মেশিন গান বসানো হয়েছে। সাদা কালো রঙ করা সারি সারি অনেকগুলো জেটি, প্রতিটি জেটিতেই বোট আর লঞ্চ, ভিড় করে আছে। বেশিরভাগই কার্গো ভেসেল, নির্মাণ সামগ্রী খালাস করছে। প্রায় খালি একটা জেটিতে ভিড়ল ওদের লঞ্চ। জেটির শেষ মাথায় দুই সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সৈনিকরা, নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন মেজর। এই সময় ডেকে বেরিয়ে এল শাহীন। হাতে সেই ছোট্ট অটোমেটিক। রানার দিকে ভুলেও সে একবার তাকাল না। রানা লক্ষ করল, ঢোলা সালোয়ার-শার্ট বদলে নতুন প্যান্ট-শার্ট পরেছে সে। লাল টুকটুকে মুখ, ঠিক যেন পাকা বেদানা।

নোঙর ফেলার পর রানার বাঁধন খোলা হলো। হায়দার আর শওকত ওর দু'পাশে থাকল, হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। পিছনে রয়েছে শাহীন, হাতের অটোমেটিক রানার মাথার পিছনে তাক করা।

জেটি আর লঞ্চের মাঝখানে একটা মোবাইল গ্যাঙওয়ে ফেলা হলো। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো মিলিটারি ভ্যান আর একটা জীপ। জেটি থেকে ডকে পা দিতেই সরাসরি রানার দিকে এগিয়ে এল মেজর। 'মাসুদ রানা?' ডান হাতটা বাড়াল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'মাসুদ রানা নামে আমি কাউকে চিনি না।' তবে বাড়ানো হাতটা ধরল। লক্ষ করল, সৈনিকরা ঘিরে ফেলেছে ওকে। লিয়াকত, হায়দার আর শওকত পিছু হটল, তাদেরকে আর দেখাই যাচ্ছে না। সৈনিকদের ভিড়ে শুধু শাহীনকে দেখতে পাচ্ছে রানা।

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, ইউ মিজারেবল লায়ার! আমি আখতার।' রানার হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল মেজর আখতার। 'আইএসআই চীফ কাল সকালে পৌঁছাবেন। তবে আজ রাতে আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর অফিসাররা তোমাকে ইন্টারোগেট করবেন। তার আগে অবশ্য ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাবে তুমি।'

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ওপর নির্দেশ আছে, তোমাকে যেন শারীরিক ও মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় অফিসারদের সামনে হাজির করা হয়,' বলল মেজর আখতার। 'গোসল, খাওয়া, বিশ্রাম–সব সুযোগই নিতে পারো।'

রানার জানতে ইচ্ছে করল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এত বিবেচক হলো কবে থেকে। বলল, 'মার্সেনারিরা আমার সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেছে। কারও সঙ্গে কথা বলার আগে অন্তত বারো ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার আমার।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি চাই, ইন্টারোগেট করার সময় বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা জানেন আমি একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, ডক্টর বাদল চৌধুরী।'

'আমি আমার কমান্ডিং অফিসারকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি,' বলল মেজর। 'বিশ্রামের জন্যে কাছেই একটা কোয়ার্টারে পাঠাচ্ছি তোমাকে। মনের সুখে আরাম-আয়েশ করো।' পাঁচজন সৈনিককে ইঙ্গিত করল সে। রানাকে নিয়ে রওনা হলো তারা। মেজর আখতার জীপে উঠে বসল, রেডিও অন করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। তার পাশের সীটে দেখা গেল শাহীনকে।

সৈনিক দু'জন রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ডক এরিয়ার বাইরে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানা বুঝতে পারল, ওর ধারণাই ঠিক। এটা আসলে একটা গ্যারিসনই ছিল, সেটাকে ক্যান্টনমেন্টে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। রূপান্তরের কাজ মাত্র শুরু হয়েছে, ফলে চারদিকে অব্যবস্থা আর বিশৃংখলার চিহ্ন চোখে পড়ে।

রাস্তার এক পাশ জুড়ে মোটা গ্যাস পাইপ বসানো হয়েছে, সেটা থেকে অনেকগুলো সরু পাইপ বেরিয়ে চলে গেছে নানাদিকে। নদীর কিনারায় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে নৌকা থেকে নামানো লাখ লাখ লালচে ইঁট। বিশাল একটা শেড ভরাট হয়ে আছে সিমেন্টের বস্তায়। পাশেই অ্যামিউনিশন ডাম্প।

আশপাশে অনেকগুলো নির্মাণাধীন পাকা দালান দেখা যাচ্ছে, কোনটারই অর্ধেক কাজ শেষ হয়নি। পুরনো ব্যারাকগুলো ভেঙে ফেলার কাজ এখনও অসমাপ্ত। ব্যারাক মানে সারি সারি প্রকাণ্ড দোচালা, দেয়ালগুলো কোনটা টিনের, কোনটা চেঁচাড়ির। সব মিলিয়ে পাঁচটা, দুটো ডান দিকে, তিনটে বাঁ দিকে। সবগুলোই পরিত্যক্ত বলে মনে হলো। কাছেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা পাওয়ার স্টেশন দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হলো সদ্য তৈরি। পরিত্যক্ত বলে মনে হলেও, বাম দিকের দোচালাগুলোয় লোকজন আছে। ডান দিকের দুটো খালি মনে হলো। দ্বিতীয়টার দরজার সামনে তিনজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। সম্ভাবনা কম, তবু রানার মনে প্রশ্নটা জাগল, মিসেস হাসান আর নেহালকে ওখানে রাখা হয়নি তো?

পাকিস্তানীদের বিশ্বাস নেই, রানার জন্যে তারা ফাঁদও পাততে পারে। তারা তো জানেই, ওকে আনা হচ্ছে। সবগুলো দোচালার সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে আনা হলো ওকে, তা না হলে ডান দিকের দ্বিতীয় দোচালার সামনে দাঁড়ানো প্রহরীদের ও দেখতেই পেত না। টোপ? ওকে আন্দাজ করতে বলছে, ভেতরে ওরা আছে কিনা? তারপর ওকে সুযোগ দেবে পালাবার, আর যেই ও দোচালায় ঢুকে মিসেস হাসানের খোঁজ করবে অমনি গুলি করে মারবে? নাহ্, বড়বেশি কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্ছে। খুন করতে চাইলে যখন তখন করতে পারে, কোন অজুহাতের প্রয়োজন নেই। তবু, প্রহরী তিনজনের কথা মনে রাখল রানা।

সবশেষে ফাঁকা জায়গায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা ব্যাক্স আকৃতির একটা কংক্রিট কাঠামোর সামনে আনা হলো রানাকে। সাতটা ধাপ বেয়ে দরজায় পৌঁছাল ওরা। দরজাটা ইস্পাতের। রানা বুঝতে পারল, ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউসটা এখন ওর পিছন দিকে। একজন সৈনিক চাবি বের করে তালা খুলল। প্রচণ্ড ঘুসির মত পচা মাংসের দুর্গন্ধ আঘাত করল নাকে। ভেতরটা প্রায়

অন্ধকার। সরু একটা প্যাসেজ দেখতে পেল রানা। দু'পাশে ইস্পাতের আরও দরজা। প্রতিটি সেলে মানুষ আছে বলে মনে হলো। সৈনিকদের একজন ভেতরে ঢুকে একটা সেলের দরজা খুলল। আরেকজন সৈনিক পিঠে ধাক্কা দিয়ে সেলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল রানাকে। ঘটাং করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

মনে মনে তিক্ত হাসল রানা। মেজর আখতার ভালই কৌতুক করতে জানে। পাকিস্তানী আতিথেয়তার এই হলো নমুনা।

তেরো

দেয়াল হাতড়ে সেলের চারধারটা ঘুরে এল রানা। কোথাও কোন খাঁজ-ভাঁজ, ফাটল বা ফুটো নেই, নিরেট কংক্রিটের ওপর সিমেন্টের প্লাস্টার ঠাণ্ডা ও মসৃণ। ইস্পাতের দরজাতেও কোন ফাঁক-ফুটো নেই।

সেলের এক কোণে বসে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল রানা, তারপর কি মনে করে আবার পকেটে রেখে দিল। আজ রোববার, ওর হাতে সময় আছে মঙ্গলবার মাঝরাত পর্যন্ত। অথচ এখনও জানতে পারেনি কোথায় রাখা হয়েছে মিসেস হাসানকে। বারবারই প্রশ্নটা জাগছে মনে, এখানেই কোন সেলে মা-বেটাকে রাখা হয়নি তো?

হঠাৎ পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মনে হলো দেয়াল থেকে আসছে আওয়াজটা। 'আমাকে চিনতে পারছ, রানা?'

আইএসআই এজেন্ট' মেজর শাকিলের কর্কশ গলা। এই শয়তানটাকে রানার চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। বছর দুই আগে বাংলাদেশ ও ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে সশস্ত্র উলফা গেরিলাদের ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব পালন করছিল শাকিল, রানার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপর গত বছরও বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গাদের নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র পাকাবার চেষ্টা করে সে। সেবার রানা তাকে বন্দী করতে পারলেও, ধরে রাখতে পারেনি। বিডিআর ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

রানা জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

'আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, পুরনো বন্ধুত্ব ঝালাই করে নিতে চাই, রানা,' আবার বলল মেজর শাকিল। 'তুমি যে মাসুদ রানা, বাদল চৌধুরী নও, দেরিতে হলেও আমরা সেটা জেনে ফেলেছি। বুঝতেই পারছ, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো, বিনিময়ে সম্ভাব্য সব রকম সুযোগ-সুবিধে আমি তোমাকে পাইয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নেই।

'প্রফেসর হাসান কত টাকার সম্পদ, রানা?' আবার কথা বলছে মেজর শাকিল। 'তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তুমি একা ভারতে এসেছিলে, একথা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না। তোমরা ক'জন, রানা? মিসেস হাসানকে উদ্ধার করতে কখন আসছে তারা?'

এবার শাকিল থামতেই অকস্মাৎ আলোর প্রচণ্ড উজ্জ্বলতায় অন্ধ হয়ে গেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল ও, তারপরও পানি গড়াতে শুরু করল। বন্ধ চোখের পাতায় আঘাত করছে, আলোটা এতই প্রখর। উৎসটা কি? কয়েক মিনিট পর অনেক কষ্টে চোখ মেলল রানা। সরাসরি তাকানো সম্ভব হলো না, তবে বুঝতে পারল সিলিঙে পাশাপাশি অন্তত বিশটা হাজার পাওয়ারের

বালব জ্বলছে, প্রতিটি তারের খাঁচায় বন্দী।

একটু পরই সব আলো নিভে গেল। অন্ধকারে চোখ রগড়াল রানা। দেয়াল থেকে আবার একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল দূরবর্তী কোন ট্রেনের হুইসেলের মত শব্দটা। ধীরে ধীরে বাড়ছে, সেলের দিকে ছুটে আসছে ট্রেনটা। যখন মনে হলো শব্দ সহ ট্রেনটা সেলকে পাশ কাটাচ্ছে, হঠাৎই আবার তা বন্ধ হয়ে গেল।

পরিবর্তে আবার কথা বলছে মেজর শাকিল। 'প্রফেসর মইনুল হাসান আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। তাঁর পাকিস্তানে আসাটা কোনভাবেই তুমি ঠেকাতে পারবে না।' ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। তারপর আবার, 'মাসুদ রানা। তুমি একা এ-কাজে হাত দাওনি। সব মিলিয়ে ক'জন তোমরা? এখানে তারা কিভাবে আসবে?'

রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর। আলো জ্বলার অপেক্ষায় রয়েছে রানা। তার বদলে আবার ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। তীক্ষ্ণ শব্দ কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ঘামছে রানা।

এই টরচারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মেন্টাল ব্রেকডাউন প্রসেস বলা হয়, পদ্ধতিটার আবিষ্কারক চীনারা। শাকিলের প্রশ্নের উত্তরে যা-ই বলুক রানা, বিশ্বাস করা হবে না।

আবার আলো জ্বলল। তারপর প্রশ্ন। তারপর হুইসেল। তবে একই ছকে নয়। রানা যখন যেটা আশা করছে সেটার বদলে অন্য কিছু ঘটছে।

শার্ট ছিঁড়ে কানে গুঁজল রানা। কয়েক ফালি কাপড় এক করে চোখ দুটো বাঁধল। হাতের কাজ নিখুঁত হওয়ায় মেজরের বকবকানি বা হুইসেল, কিছুই শুনতে পাচ্ছে না আর। আলোগুলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাও বলতে পারবে না।

ঘড়ি দেখার উপায় নেই, তবে একসময় রানা আন্দাজ করল এখন বোধ হয় রাত।

আরও প্রায় তিন ঘণ্টা পর ওকে নিতে এল ওরা। দরজা

খোলার শব্দ কানে ঢোকেনি, তাজা বাতাসের স্পর্শ সচকিত করে তুলল ওকে। তারপর অনুভব করল সেলে ঢুকেছে ওরা। চোখের পট্টি টান দিয়ে খুলে নিল একজন সৈনিক। এখন মাত্র একটা বালব জ্বলছে, তাসত্ত্বেও চোখ মেলতে পারছে না রানা। একজন সৈনিক ধরে দাঁড় করাল ওকে। আরেকজন সৈনিক ওর কান থেকে কাপড়ের খুদে বল দুটো আঙুল দিয়ে খুঁটে বের করে নিল।

সেলের বাইরে এসে চোখ পিটপিট করল রানা। মাত্র দু'জন সৈনিক নিতে এসেছে ওকে। দু'জনেই ওর পিছনে থাকল, বাগিয়ে ধরা রাইফেল ওর পিঠে তাক করা।

দালানের বাইরে পা দিতেই আলোয় উদ্ভাসিত পাওয়ার হাউসটা দেখতে পেল রানা।

সৈনিক দু'জন ওকে পথ নির্দেশ দিয়ে শেষ প্রান্তের একটা দোচালার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি দোচালাই অন্ধকার দেখল রানা। আসলে সৈনিকদের ব্যারাক এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দোচালাগুলো প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে, যে-কোন দিন ভেঙে ফেলা হতে পারে। দিনের বেলা ডক থেকে বেরুবার পর আধ মাইল দূরে সারি সারি পাকা দালান দেখেছিল ও, ওগুলোই সম্ভবত নতুন ব্যারাক।

কংক্রিটের টরচার হাউস থেকে সৈনিকরা ওকে হাঁটিয়ে আনছে। আকাশের গায়ে কাছে-দূরে লাল আলো দেখতে পাচ্ছে রানা, দিনের বেলা দেখা ক্রেনগুলোর মাথায় জ্বলছে ওগুলো।

শেষ প্রান্তের দোচালার সামনে একটা জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভিং সীটে মেজর আখতারকে দেখল রানা। আরও কে যেন চেয়ে আছে, অনুভূতি হলো ওর। ঘাড় ফেরাল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে শাহীন। হাসল, হাত নাড়ল রানা, আসলে মেয়েটিকে আশ্বস্ত করছে না, অভয় দিচ্ছে নিজেকেই।

ধীর পায়ে জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল শাহীন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। আশ্চর্য এক মানুষ!—ভাবছে ও। জানে

মরতে চলেছে, কিন্তু মুখে হাসি। দু'ফোঁটা পানি এসে গেল ওর চোখে। এই সাহসী মানুষটাকে জীবনে আর কোনদিন দেখবে না ও। নিজের অনুভূতির গভীরতায় নিজেই চমকে গেছে ও। মাসুদ রানা নামের স্বল্পভাষী লোকটা যে এতটা গভীর ছাপ ফেলবে ওর মনে, তা ভাবতেও পারেনি। কিছুই কি করার নেই ওর? দু'এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর গিয়ে দাঁড়াল টেলিফোনটার সামনে। মেজর জেনারেলের নম্বরে রিং করল। কথা বলল মিনিট খানেক, তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে আবার এসে দাঁড়াল জানালার সামনে। ব্যস্ত মানুষ মেজর জেনারেল এটা মনে রেখেই যা করার করেছে ও। মেজর জেনারেল ওকে বেশি গুরুত্ব না দিলে বাঁচা যায়।

কার সঙ্গে যেন ওয়্যারলেসে আলাপ করছে মেজর। সেটটা রেখে দিল। হাতের ইশারা করল। রাইফেলের গুঁতো খেয়ে জীপের পিছনে উঠে বসল রানা। সৈনিক দু'জনও উঠল। পিছনের আরেক সীটে আগে থেকেই বসে আছে একজন ক্যাপটেন। এখনও চেয়ে আছে শাহীন।

জীপ ছেড়ে দিয়ে মেজর আখতার বলল, 'গোসল, খাওয়া, বিশ্রাম কেমন হলো তা তো বললে না!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল সে। একটু পর আবার জিজ্ঞেস করল, 'জানতে ইচ্ছে করছে না, কার কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে?'

'মেজর শওকত,' আন্দাজ করল রানা।

'এইমাত্র তার সঙ্গে রেডিওতে কথা হয়েছে আমার,' বলল মেজর আখতার। 'ইন্টেলিজেন্সের লোক, সামরিক বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে ওদের ধ্যান-ধারণা মেলে না। সব শুনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কিন্তু আমার হাতে কর্তৃত্ব থাকলে আমি তোমাকে এখুনি ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করাতাম। এটুকু দয়া যে-কারও প্রাপ্য।'

রানা কোন কথা বলছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল।

পাশের কামরা থেকে রেডিওর শব্দ আসছে। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, ভাষাটা উর্দু। একই ভাষায় জব্যব দিচ্ছে রেডিও অপারেটর। সবই খুব অস্পষ্ট, শুধু একটা নাম চিনতে পারল রানা। গব্বর সিং।

তারমানে মেসেজটা আসছে রিয়াসির লেডি সুরাইয়া'স ইন থেকে।

দোচালার ভেতরে ঢোকার পর, লেইযার প্রিন্টার থেকে প্রিন্টআউট বেরিয়ে আসার মত, রানার মাথা থেকে একটা প্ল্যান বেরিয়ে এল। এখনও সেটাকে স্রেফ খসড়া ছাড়া কিছু বলা যায় না, তবে পরিবর্তন ও সংশোধন করার সুযোগ আছে।

তৃতীয় কামরার দরজা খুলে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিয়াকত, হাতে সেই ভারী রিভলভার। মেজর আখতারকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুট করল সে, এক পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল। পিঠে রাইফেলের গুঁতো খেয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, ওর পিছু নিয়ে মেজর আখতার; সৈনিক দু'জন বাইরে থাকল, দরজাটা বন্ধ করে দিতে ভুলল না।

বাকি দুটো কামরার চেয়ে এটা একটু ছোট। শুধু এটাতেই একটা গরাদহীন জানালা আছে। ফার্নিচার বলতে একটা কট, একটা টেবিল, একটা বেতের চেয়ার, লম্বা একটা বেঞ্চ। এ ঘরে তিনটে হ্যারিকেন, দুটো দু'দিকের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, বাকিটা টেবিলের ওপর।

কটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে শাহীন, পাকিস্তানে এলে এখানেই ওঠে সে। এখন ওর মুখ ছাড়া সারা শরীর চাদরে ঢাকা। চোখ দুটো বন্ধ, তবে রানার সন্দেহ হলো সে জেগেই আছে। পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে কে যেন, গুরু গুরু মেঘ ডাকার আওয়াজ আসছে নাক থেকে।

'আহা, ছোটভাই ঘুমাচ্ছে!' নরম সুরে বলল মেজর আখতার। 'কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু কথা ছিল যে!'

'আমি জেগেই আছি!' বলে ঝট করে চাদর সরিয়ে উঠে বসল

শাহীন। রানাকে দেখে মনে হলো ভয় পেয়েছে, কট থেকে লাফ দিল শাহীন, একপাশ থেকে মেজরকে জাপটে ধরল। রানা দেখল, চওড়া কটের ওপর একটা টমিগান পড়ে রয়েছে, পাশেই মিটিমিটি হাসছে ওর ল্যুগার আর ছুরি।

শাহীন কি চাইছে বুঝেই প্রথমে মাথা, তারপর বগল চুলকাবার ছলে টান দিল রানা টেপে; সঙ্গে সঙ্গে হাতে চলে এল খুদে গ্যাসবোমাটা। কিন্তু টানটা লিয়াকতের চোখে পড়ে গেল। .৪৫ তুলে রানাকে টার্গেট করতে যাচ্ছে, পিছিয়ে এসে ঝপ করে বসে পড়ল রানা কটের পাশে, লিয়াকত আর ওর মাঝখানে এখন মেজর ও শাহীন। বোমাটা রানা ফাটিয়ে দিয়েছে। গন্ধহীন গ্যাস কামরায় ছড়িয়ে পড়তে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল। আড়ষ্ট হয়ে গেল লিয়াকতের হাত, টলছে সে। বিপদ টের পেয়ে রানার দিকে শাহীনকে ঠেলে দিল মেজর। আর ঠিক সেই সময় টমিগান হাতে সিধে হলো রানা। শাহীনকে পাশ কাটিয়ে ছুটে এল এক পশলা তপ্ত সীসা, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মেজরের গলা থেকে নাভি পর্যন্ত ইউনিফর্ম, ওই একই ঝাঁকের বাকি বুলেট নাচিয়ে দিল লিয়াকতকে।

দম বন্ধ করে আছে রানা, অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মেঝেতে পড়ে গেছে শাহীন, তার চোখে চোখ রেখে নিজের নাক দু'আঙুলে টিপে ধরল রানা। পরমুহূর্তে এক পশলা গুলি করল খুলতে শুরু করা দরজার দিকে। আর্তনাদ আর গোঙানির আওয়াজ ঢুকল কানে। পাশের ঘরে হৈ-চৈ, চিৎকার আর হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। কট থেকে ল্যুগার আর ছুরিটা তুলল রানা, ওগুলোর পাশে এক গোছা চাবি পড়ে থাকতে দেখে ঝট করে একবার তাকাল শাহীনের দিকে। নাকে হাত চাপা দিয়ে এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, চোখে পলক পড়ছে না। ছোঁ দিয়ে চাবিগুলো তুলল রানা। তারপর ইঙ্গিতে খোলা জানালাটা দেখাল শাহীনকে।

উত্তরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল শাহীন। রানার গায়ে ঘষা-খেয়ে সিধে হলো সে, দু'হাতে আঙুল বোলাল ওর গালে, তারপর ছুটে গিয়ে জানালা টপকালো।

জানালা দিয়ে তখনও শাহীন বেরিয়ে যায়নি, ল্যুগার তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল রানা, পর পর তিনটে গুলি লেগে বিস্ফোরিত হলো দেয়াল ও টেবিলের তিনটে হ্যারিকেন। দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের বেড়া। আগুন দেখার জন্যে রানা অপেক্ষা করেনি, ডাইভ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে জানালা দিয়ে।

একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা, দোচালা ঘেঁষে ছুটছে, শাহীনকে কোথাও দেখতে পেল না। সদর দরজায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে জীপটা, খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে রয়েছে ক্যাপটেন দস্তগির। তার খুলি উড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, হাতে অনলবর্ষী টমিগান ঝাঁকি খাচ্ছে। ঘেরা বারান্দায় দাঁড়ানো তিনজন রাইফেলধারী সৈনিক ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে আরেকটা চৌকাঠ পেরুল রানা, তিন পাশের দরজার বেড়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। লাফ দিয়ে অ্যামিউনিশন বক্সের সামনে চলে এল রানা। শার্ট খুলে কোমরে জড়াল, সদ্য তৈরি থলেতে পনেরো-ষোলোটা গ্রেনেড ভরছে, ভেতর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা রাইফেলের ব্যারেল। কোমরের কাছ থেকে টমিগানের ট্রিগারের টানল রানা, দরজা সহ রাইফেলটা উড়ে গেল পিছনদিকে। পিছু হটে রেডিও রূমে ঢুকে পড়ল রানা।

গ্যাস বোমা ফাটাবার পর তিন মিনিট পার হয়ে গেছে, অথচ আসল কাজে এখনও হাতই দেয়া হয়নি। চাবি আছে ঠিকই, ধরেও নেয়া চলে এই চাবি দিয়ে মুক্ত করা যাবে মিসেস হাসান আর নেহালকে, কিন্তু ওদেরকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে সেটাই তো ওর জানা নেই। রেডিও রূমে পা দিতে না দিতে ঢংঢং ঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ছুটে আসার শব্দ শুনল রানা,

তারই সঙ্গে গোটা ক্যান্টনমেন্টকে সচকিত করে দিয়ে চারদিক থেকে মাতম শুরু করল একটানা সাইরেনের আওয়াজ।

রেডিওরুম ফাঁকা। পিছিয়ে বেরুতে যাবে রানা, এক ঝাঁক বুট জুতোর শব্দ পেয়ে থমকে গেল। দোচালার সামনে চলে এসেছে একদল সৈনিক। ভাগ্য ভাল যে জানালা আছে এই ঘরেও, পাশের কামরার আগুন এখনও সেটা ছুঁতে পারেনি। ডাইভ না দিয়ে জানালা টপকে উল্টোদিকে ঝপ করে নামল ও, জানাল্যর নিচে ঘাপটি মেরে বসে থাকল, থলে থেকে একটা গ্রেনেড নিয়ে পিন খুলে ফেলেছে।

আগুন দেখে ছুটে আসা সৈনিকরা জটলা পাকিয়েছে ঘেরা বারান্দায়, নির্দেশ দেয়ার মত কেউ না থাকায় ইতস্তত করছে। আট পর্যন্ত গুনে খোলা জানালা দিয়ে গ্রেনেডটা ভেতরে ছুঁড়ল ও, ছুঁড়েই ছুটল, দোচালা থেকে যত দূর সম্ভব সরে যাচ্ছে। দশ পা-ও এগোতে পারেনি; বিস্ফোরণের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ঘাড় ফেরাতে দেখল দোচালার ছাদ খানিকটা ওপরে উঠে গেছে, আগুন না ধরা অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

সিধে হয়ে আবার ছুটছে রানা, হাতে আরেকটা পিন খোলা গ্রেনেড। লাফ দিয়ে একটা সরু ও লম্বা গর্ত টপকাল, হাতের গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল অ্যামিউনিশন ডাম্প লক্ষ্য করে। মাথা নিচু করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা পাওয়ার স্টেশনের দিকে ছুটছে।

সিমেন্ট ভরা একটা গোডাউনকে পাশ কাটাল রানা, এই সময় নির্মাণাধীন ক্যান্টনমেন্টে যেন অ্যাটম বোমা ফাটল। বিস্ফোরণের অনেক রকম আওয়াজ শুনেছে ও, কিন্তু এই আওয়াজের সঙ্গে সেগুলোর কোন তুলনা হয় না। আকাশ, মাটি বিদীর্ণ করে দিল অ্যামিউনিশন ডাম্পের কয়েক টন বারুদ। আওয়াজটা বোধহয় বিশ মাইল দূর থেকেও শোনা গেল। সিমেন্টের গোডাউনটা এক পলকে গুঁড়িয়ে গেল এক দেড় লাখ সিমেন্ট ভর্তি বস্তা সহ।

আগুনের অসম্ভব চওড়া একটা স্তম্ভ তির্যক পথ ধরে ছুটল, যেন আকাশ ছুঁতে চায়। তারই সঙ্গে শুরু হয়েছে গ্রেনেডের একটানা বিস্ফোরণ, প্রলয়ংকরী একশো ঝড় একযোগে চড়াও হলেও বোধহয় এই আওয়াজের সমতুল্য হতে পারবে না।

মিহি ধূলিকণায় ঢাকা পড়ে গেল আধখানা চাঁদ সহ প্রায় গোটা আকাশ, সৈনিকদের খাকি ইউনিফর্ম সাদা হয়ে গেল, সর পড়ল নদীতে। রানা বেঁচে গেছে ভাগ্যগুণে, গোডাউন থেকে বিশ গজ দূরে থাকায়। সামনে একটা রাস্তা দেখে পার হলো ও, একজোড়া খেজুর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একের পর এক তিনটে গ্রেনেডের পিন খুলে ছুঁড়ে দিল ত্রিশ গজ দূরের পাওয়ার স্টেশন লক্ষ্য করে।

পাওয়ার স্টেশনের সেন্ট্রিরা কে কোথায় লুকিয়েছে বলা মুশকিল। গেট ও কাঁটাতারের বেড়া টপকে স্টেশনের জটিল ইকুইপমেন্টের ঠিক মাঝখানে পড়ল প্রথম দুটো গ্রেনেড। তৃতীয়টা পড়ল আরও দূরে, চৌকো একতলা দালানের ছাদে।

পাওয়ার স্টেশনের বিস্ফোরণ দেখার জন্যে অপেক্ষা করেনি রানা, রাস্তা ধরে টরচার হাউসের দিকে ছুটছে। বেশি দূর যেতে পারল না, পরপর তিনটে বিস্ফোরণ পায়ের নিচে এমন কাঁপিয়ে দিল মাটি, বসে পড়তে বাধ্য হলো ও। ঘাড় ফেরাতে পাওয়ার স্টেশনের কোনও অস্তিত্বই দেখল না, সাদা ধোঁয়ার ভেতর নীল সাপের মত ছুটোছুটি করছে অসংখ্য বৈদ্যুতিক রেখা।

টলতে টলতে সিধে হলো রানা, দেখল উল্টোদিক থেকে ছুটে আসছে একজোড়া হেডলাইট। মনে হলো এখনও অনেক দূরে ওগুলো, কিন্তু রানা রাস্তা থেকে সরে আড়াল নেয়ার আগেই কাছে চলে এল। একটা জীপ। ভেতরে আলো জ্বলছে।

ইউনিফর্মে সাঁটা ব্যাজ আর পদক বলে দিল ড্রাইভিং সীটে বসা অফিসার একজন কর্নেল। রাস্তার পাশে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে সাদা একটা ভূত যেন, অথচ ঠিকই ওকে রানা হিসেবে

চিনতে পেরে ইঙ্গিতে টরচার হাউসটা দেখিয়ে দিল কর্নেলের পাশে বসা একমাত্র আরোহী। সূক্ষ্ম পরাজয়টা এক্ষেত্রে বলা যায় রানারই হলো, কারণ শাহীনকে চিনতে এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেছে ওর। রাস্তার পাশে এরকম সাদা মানুষ দেখতে দেখতে আসছে কর্নেল, কাজেই জীপ থামাবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না। তবে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল কাশ্মীরীদের গর্ব বীরাঙ্গনা শাহীনকে।

টরচার হাউস ফাঁকা পড়ে আছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, ইস্পাতের ভারী দরজা বন্ধ করে দেয়াল ধরে এগোল। দু'দিকেই পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা, কোন্ সেলের ভেতর কে আছে বোঝার কোন উপায় নেই।

'মিসেস মইনুল হাসান! নেলী হাসান! নেহাল!' চিৎকার করল রানা। কোন সাড়া নেই। এরপর দ্বিতীয় দরজার কী হোলে মুখ নামিয়ে আবার ওই একই চিৎকার।

চার নম্বর সেল থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর, 'হু'জ দেয়ার?' নারীকণ্ঠ নয়, মনে হলো কোন কিশোর।

'অপেক্ষা করো, নেহাল।' বলে কী হোলে একের পর এক চাবি ঢোকাল রানা। তিনবারের বার ক্লিক করল।

ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে দেশলাই জ্বালল রানা। সেলের এক কোণে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিসেস মইনুল হাসান। 'কে আপনি?' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, ভদ্রমহিলা থরথর করে কাঁপছেন।

'আমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশ সরকারের একজন সিকিউরিটি অফিসার,' বলল রানা। 'সরকার এবং প্রফেসর মইনুল হাসানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছি। বাইরে আগুন জ্বলছে, গোলাগুলিও হবে, পালাতে চাইলে সারভাইভ করার চান্স ফিফটি-ফিফটি। আপনি রাজি?'

কাঠিটা নিভে গেল।

'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?' রানার ইংরেজির বদলে বাংলায় প্রশ্ন করলেন মিসেস হাসান। 'আপনার সঙ্গে কোন পরিচয়-পত্র আছে? হাসানের কোন চিঠি?'

'এটা দেখুন,' বলে আরেকটা কাঠি জ্বালল রানা, পকেট থেকে বের করে ফটোগ্রাফটা ধরিয়ে দিল মিসেস হাসানের হাতে।

ফটোটা নিলেন ভদ্রমহিলা। উল্টো পিঠটাও দেখলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন–'ইনি মাসুদ রানা, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছেন, সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করবে।'

'মম্! ডেকি-ডেকি, আমার ফটো না?' মায়ের হাত থেকে ফটোটা প্রায় কেড়ে নিল কিশোর নেহাল। 'ওহ্, গড...হায় আল্লা, ড্যাডির হ্যান্ডরাইটিং,' তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'পরে, ভাই, পরে,' নেহালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল রানা। 'মিসেস হাসান, সৈন্যরা যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে এখানে। কোন প্রশ্ন করবে না, দেখামাত্র গুলি করে তিনজনকেই মেরে ফেলবে। আপনারা আমার সঙ্গে আসছেন তো?'

'অফকোর্স!' চেঁচিয়ে উঠল নেহাল। 'কেন যাবে না। অবশ্যই আমরা যাবে।'

'ঠিক আছে,' অবশেষে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস হাসান। 'কিন্তু আপনার সঙ্গীরা কোথায়?'

'সঙ্গী নেই, আমি একা, মিসেস হাসান। আপনারা সাঁতার জানেন?'

'ইয়েস, স্যার! সুইমিং পুলে শিখেছি...'

'গুড। এখন মন দিয়ে শোনো কি করতে হবে তোমাদের। এখান থেকে একসঙ্গেই বেরুব আমরা। মাকে নিয়ে দালানটার পিছন দিকে ছুটবে তুমি, আমি তোমাদেরকে কাভার দেব।'

'ইট'স লাইক আ সিনেমা!' নেহালের গলায় উল্লাস ও বিস্ময়। 'অ্যান্ড আই য়্যাম ইন ইট অ্যাজ আ হেলপার অব মিস্টার

জেমস বন্ড!'

হেসে ফেলল রানা। 'ও-সব তো গল্প, কিন্তু এখানে তোমাকে বাস্তবে হিরো হতে হবে। যা বলছিলাম। এই দালানের পিছন দিকে পৌঁছে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর লুকাবে তোমরা। ওখান থেকে খালটা কোন দিকে, তুমি জানো?'

'জানি,' জবাব দিলেন মিসেস হাসান, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব।

'ঝোপ থেকে বেরুবেন না,' বলল রানা। 'খালের দিকে যাবেন একটু বাঁকা পথ ধরে, যাতে ভাটির দিকে পৌঁছাতে পারেন। খালের কিনারায় পৌঁছে অপেক্ষা করবেন যতক্ষণ না একটা লঞ্চ দেখেন। ওটার রঙ এক সময় সবুজ ছিল, এখন কালচে দেখায়, গায়ে ঝাপসা অক্ষরে লেখা আছে এম.ভি. চেনাব। ওটাকে দেখামাত্র পানিতে নেমে সাঁতরাতে শুরু করবেন। পানিতে রশি ফেলা থাকবে, আপনারা যাতে ধরতে পারেন। নেহাল, সব কথা মনে থাকবে তোমার?'

'না থাকবে কেন! ড্যাডি তো সব সময় বলে আমার ব্রেন যথেষ্ট শার্প।'

'গুড। এসো তাহলে।'

প্রায় দেড় মাইল ছুটল রানা, ঘুরপথ ধরে উল্টোদিক থেকে ডকে আসছে। পায়ে হাঁটা সৈনিক থেকে শুরু করে ট্রাক, ভ্যান ও জীপের একই গন্তব্য—আগুন। দোচালার আগুন ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে পরিত্যক্ত সবগুলো ব্যারাকে। ফায়ার ব্রিগেডের তিনটে গাড়ি বৃথাই চেষ্টা করছে, এমনকি দমকল কর্মীরাও বুঝতে পেরেছে সব কিছু ছারখার না করে এ আগুন নিভবে না।

পাওয়ার স্টেশনের আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। আসলে এখানকার সমস্ত ইকুইপমেন্টই লোহা ও ইস্পাতের তৈরি, কিছু রাবার ছাড়া পোড়ার মত তেমন কিছু ছিল না। আগুন নিভলেও,

দেখে ওটাকে এখন আর পাওয়ার স্টেশন বলে চেনার উপায় নেই, কুৎসিত একটা কংকালের মত লাগছে।

আগুনের তির্যক স্তম্ভটা আগের মতই আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। একটানা সেই গর্জন বাকি সমস্ত শব্দকে চাপা তো দিচ্ছেই, আতংকিত সৈনিকদের স্নায়ুতে আঘাত করে আরও বিশৃংখল করে তুলছে তাদের। মিহি সিমেন্ট ঘন কুয়াশার মত ভেসে আছে বাতাসে। চারদিকে সাদা মানুষের ছুটোছুটি। সবাই পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে, কাউকেই আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই। সবার সঙ্গে সবার, এমনকি রানারও, প্রায় নিয়মিত ধাক্কা লাগছে।

ডক এরিয়ায় পৌঁছাবার আগে আরও একটা গ্রেনেড ফাটাল রানা। এক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচটা পেট্রল ভর্তি ট্যাংকার, মাঝখানেরটা বিস্ফোরিত হতে বাকিগুলোরও একই অবস্থা হলো।

কাছে এবং দূরে গুলি হচ্ছে, কারণটা রানা বলতে পারবে না। ওরা কি নিজেদের মধ্যে গুলি বিনিময় করছে? এরকম পরিস্থিতিতে সেটা অসম্ভব নয়। কিংবা কে জানে, সবই হয়তো ফাঁকা ফায়ার করছে, অদৃশ্য শত্রুকে ভয় দেখানোর বা নিজেদেরকে সাহস যোগানোর জন্য।

ডক এরিয়ায় ঢুকে থমকে দাঁড়াল রানা। এখানে যে বিশৃংখলা চলছে চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এটা আসলে খাল, তবে নদীর মতই চওড়া আর স্রোতও খুব তীব্র। পাশাপাশি জেটিগুলোয় মোটর ভেহিকেলের যে ভিড়টা ছিল সেটা এখন ছত্রাখান হয়ে গেছে। ডকে আলো নেই, সবগুলো স্পটলাইট ও সার্চলাইট বন্ধ, জলযানগুলো নিজেদের আলো জ্বেলে নোঙর তুলছে, কে কার আগে খালের নিরাপদ অপর পারে পৌঁছাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। একই কাজ সবাই একযোগে করতে গিয়ে পরস্পরের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। ডকের কিনারা ধরে সতেরো নম্বর জেটির দিকে ছোটার

সময় পিন খুলে আরও তিনটে গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা। একটা ছোট স্টীমার, একটা লঞ্চ আর একটা স্পীডবোট অকস্মাৎ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো।

এম.ভি. চেনাবে ওঠার সময় বা ওঠার পরও রানাকে কোন বাধার সামনে পড়তে হলো না। ডক এরিয়ার বাইরে থেকে এখনও গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। নোঙর তুলে লঞ্চ ছাড়ল রানা, খালের অন্ধকার কিনারায় চোখ, মিসেস হাসান আর নেহালকে খুঁজছে।

কিনারায় নয়, খালের সামনের পানিতে দেখা গেল ওদেরকে। রশিটা ছুঁড়ে দিতে নেহাল সেটা আগে ধরল। মায়ের জন্যে অপেক্ষা করল এক মিনিট, তারপর দু'জন একসঙ্গে লঞ্চের গায়ে ভিড়ল। ডেকে উঠতে নেহালকে সাহায্য করল রানা; নেহাল তার মাকে টেনে তুলল।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নেহাল।

'এখনও ধন্যবাদ দেয়ার মত কিছু ঘটেনি,' বলল রানা, যদিও হাসছে; বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন অভাব নেই অন্তরে। তিনজনের কারও গায়েই এখন পর্যন্ত একটা আঁচড়ও লাগেনি। 'মিসেস হাসান, দেখুন কেবিনে হয়তো কিছু কাপড়চোপড় পাবেন।' হ্যাচটা কোথায় বলে দিল নেহালকে, ওখানে কিছু ফল-টল পাওয়া যেতে পারে।

উল্টোদিক থেকে সৈনিক নিয়ে স্পীডবোট আসছে শুধু, অন্য কোন জলযান চোখে পড়ছে না। ক্যান্টনমেন্টের দিকে নদীর পার খালি ও অন্ধকার।

আধঘণ্টা পর হুইলহাউসে ঢুকলেন মিসেস হাসান। হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই পরেছেন তিনি, ঢোলা একটা শার্ট আর ট্রাউজার। একটা প্লেটে করে কিছু ফল আর দু'কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে এসেছেন তিনি। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। কাল রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কি পরম মমতায় মুখে তুলে ওকে

খাওয়াল শাহীন। আশ্চর্য, ওর নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি! কে জানে, হয়তো কোনদিনই তা জানা হবে না। ছিঃ, এত অকৃতজ্ঞ তুমি হতে পারলে! নিজেকে তিরস্কার করল রানা। নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে যে তোমাকে পালাতে সাহায্য করল, অন্তত একটা ধন্যবাদ জানাবার জন্যে এক সুযোগে রিয়াসিতে তুমি আসতে পারবে না? আসতে তোমাকে হবেই, আসতে তুমি বাধ্য।

'আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।' নরম গলায় বললেন মিসেস হাসান।

তাঁর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি হেসে রানা বলল, 'দুঃখিত।' এই প্রথম ভদ্রমহিলার দিকে ভাল করে তাকাল ও। বেশ একটু অবাকই হলো বলা যায়। এতক্ষণ ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি। ভদ্রমহিলা অসাধারণ সুন্দরী। 'নেহাল কোথায়?' দৃষ্টি সংযত করে জানতে চাইল রানা।

'খেতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে,' বলল মিসেস হাসান। 'একটানা প্রায় ছ'মাস যে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে...'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে, আপনার কোন ধারণা আছে?'

মিসেস হাসানের চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। 'বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। একদিন দুপুরে কয়েকজন লোক এল বাড়িতে, বলল তারা নাকি হাসানের বন্ধু। হঠাৎ আমাকে ধরে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করল। তারপর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখি ওই সেলে আটকে রেখেছে। আখতার নামে এক মেজর প্রায়ই ঢুকত সেলে, আজেবাজে প্রস্তাব দিত, ভয় দেখাত...'

'থাক, ও-সব ভুলে যান,' নরম সুরে বলল রানা।

'কিন্তু হাসান কেমন আছে তা তো আপনি একবারও বলছেন না।' হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল মিসেস হাসানকে।

'শেষ খবর জানি, তিনি কাশ্মীরের রিয়াসিতে আছেন, ভালই আছেন,' বলল রানা। 'তবে বিশ ঘণ্টার মধ্যে রিয়াসিতে পৌঁছাতে হবে আমাদের, তা না হলে পাকিস্তানীরা তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, এ-সব জমা থাকল,' ক্ষীণ হেসে মিসেস হাসান বললেন। 'আপনি বরং আমাকে একটা ধারণা দিন, সামনে ঠিক কি ধরনের বিপদ আশঙ্কা করছেন আপনি।'

'ওরা ধাওয়া করতে পারে,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তাছাড়া, আমাদেরকে সীমান্ত পেরুতে হবে।'

'আমরা কোন সাহায্যে আসব কি?'

'সেটা এখনই বলতে পারছি না। আপনি বরং যতটা সম্ভব বিশ্রাম নিন, দরকার হলে আমি ডাকব।'

মিসেস হাসান চলে যাবার পর বাঁক নিয়ে খাল থেকে নদীতে চলে এল লঞ্চ। তারপর, হাতে হুইল থাকা সত্ত্বেও ঢুলতে শুরু করল রানা।

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না, মিসেস হাসানের ছোঁয়ায় ঝাঁকি খেলো রানা, চোখ মেলে দেখল ভোর হচ্ছে।

'ধরুন, খুব দরকার আপনার,' বলে রানার হাতে আরও এক কাপ ধূমায়িত চা ধরিয়ে দিলেন মিসেস হাসান।

'নেহাল কোথায়?' কাপে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'ওই তো, বো-র কাছে বসে নদী দেখছে...'

'মাশুড ভাই! মাশুড ভাই!' হঠাৎ নেহালের চিৎকার ভেসে এল। 'একটা বোট আসছে!'

'হুইলটা ধরুন!' মিসেস হাসানকে বলল রানা, ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

বো-র কাছে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে নেহাল, হাত তুলে বো-র স্টারবোর্ড সাইডটা দেখাল রানাকে। 'ওই দেখেন, আপ রিভার থেকে আসছে। এটার বাংলা কি হবে?'

'উজান।' দেখেই চিনতে পারল রানা, একটা গানবোট। স্পীড এত বেশি, পানি প্রায় ছুঁচ্ছেই না। অস্পষ্টভাবে দেখা গেল ফোরডেকের মেশিন গানের পিছনে একজোড়া ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বো-র কাছে একজোড়া মর্টারও দেখা যাচ্ছে। ছুটে আসার ভঙ্গি আর সৈনিকদের সরাসরি এদিকে তাকিয়ে থাকা দেখেই বোঝা যায় ওরা জানে এম.ভি. চেনাবে মিসেস হাসান আর নেহাল আছে। উজানের দিকে আরও দূরে কোথাও ছিল, জরুরী রেডিও মেসেজ পেয়ে বাধা দিতে আসছে।

ঝুঁকে নেহালের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'গুড বয়। এসো, একটা প্ল্যান করি।' নেহালকে নিয়ে হুইলহাউসে ফিরে এল ও, থলে খুলে কয়েকটা গ্রেনেড বের করল।

'কি ঘটবে এখন?' মিসেস হাসান শান্ত থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, তাঁর গলা বিকৃত শোনাল।

'গানবোট,' বলল রানা। 'ওরা সম্ভবত আপনাদের কথা জানে। লঞ্চ ভ্রমণের এখানেই সমাপ্তি।' তিনটে গ্রেনেড বাইরে রেখে বাকিগুলো সহ থলেটা কোমরে বেঁধে নিল ও। 'আমি চাই আপনারা এখুনি সাঁতার কেটে পারে উঠুন।'

'কিন্তু...'

'এখুনি মানে এখুনি, মিসেস হাসান। এটা তর্ক করার সময় নয়, প্লীজ।'

রানার বাহু স্পর্শ করল নেহাল, পরমুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে গেল হুইলহাউস থেকে, ডেকের কিনারায় পৌঁছে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল। মিসেস হাসান অপেক্ষা করছেন, সরাসরি রানার চোখে চোখ। 'আপনি মারা পড়বেন,' অস্ফুটে বললেন।

'আমার একটা প্ল্যান আছে, নিজেকে রক্ষা করার,' বলল রানা, 'আপনি যান। ভাটির দিকে কোথাও দেখা হবে।'

মিসেস হাসান বেরিয়ে গেলেন। পানিতে লাফিয়ে পড়ার শব্দ পেল রানা। হুইলটা বাম দিকে বন বন করে ঘোরাল ও, নদীর

ওপর আড়াআড়ি হয়ে যাচ্ছে লঞ্চ। ইতিমধ্যে গানবোট অনেক কাছে চলে এসেছে। বো গান থেকে কমলা শিখা লাফ দিল। বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল মর্টার শেল, লঞ্চের নাকের সামনে বিস্ফোরিত হলো। ঝাঁকি খেলো এম. ভি. চেনাব।

লঞ্চের পোর্টসাইড গানবোটের দিকে। রানা হুইল লক করে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এসে পজিশন নিল মেইন কেবিনের আড়ালে, স্ট্র্যাপের সঙ্গে কাঁধে ঝুলছে টমিগান। গানবোট এখনও ওর রেঞ্জের অনেক বাইরে।

আবার গর্জে উঠল কামান। শিস কেটে ছুটে আসা শেলটা এবার লঞ্চের নাক যেখানে পানিতে মিশেছে সেখানে বিস্ফোরিত হলো। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা, রেইলিং ধরে কোন রকমে ঠেকাল পতনটা। লঞ্চের সামনের অংশ ডুবছে। তবু রানা পজিশন ছেড়ে নড়ছে না। ইতিমধ্যে আরও কাছে চলে এসেছে গানবোট। তিনজন সৈনিক মেশিন গান থেকে ফায়ার শুরু করল। কেবিনটা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। এখনও অপেক্ষা করছে ও।

স্টারবোর্ডের দিকে ধীরে ধীরে কাত হচ্ছে লঞ্চ। ডুবে যেতে খুব বেশি সময় নেবে না। গানবোট এখন এত কাছে, সৈনিকদের মুখভাব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। নির্দিষ্ট একটা শব্দের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। সৈনিকরা গুলিবর্ষণ বন্ধ রেখেছে। স্পীড কমে গেছে গানবোটের। এই সময় আওয়াজটা পেল রানা।

গানবোট লঞ্চের পাশে চলে আসছে। এঞ্জিনের শব্দ কমল, প্রপেলার উল্টোদিকে ঘুরছে। রানা মাথা উঁচু করল উঁকি দেয়ার জন্যে যতটুকু দরকার। দুই সেকেন্ড পর ফায়ার শুরু করল, বুলেটের প্রথম ঝাঁকটা বো মর্টারের দুই গোলন্দাজকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নদীতে। মাযলটা এদিক ওদিক দু'বার বুলাল রানা, ট্রিগারে চেপে বসে আছে আঙুল। বাকি তিন গান ম্যান ঝাঁকি খেতে খেতে পরস্পরের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। ডেক কর্মী ও অন্যান্য

সৈনিকরা ডাইভ দিয়ে ডেকে শুলো, ক্রল করে সরে যাচ্ছে আড়ালে।

টমিগান রেখে প্রথম গ্রেনেডের পিন খুলল রানা। একের পর এক তিনটে গ্রেনেড ছুঁড়ে টমিগান তুলে পিছু হটল, ঝপাৎ করে নদীতে পড়ে তলিয়ে গেল পানির নিচে। গ্রেনেড আর টমিগানের ওজন সারফেসে ভেসে উঠতে দেরি করিয়ে দিল ওকে। শক ওয়েভের ধাক্কা তারপরেও ভালই টের পেল। মাথা তুলল আহত লঞ্চের পাশে। ওর দ্বিতীয় গ্রেনেড গানবোটের কেবিন ভেঙে দু'টুকরো করে দিয়েছে। প্রথমটা উড়িয়ে দিয়েছে পুরো বো। তৃতীয়টা সম্ভবত পানিতে বিস্ফোরিত হয়েছে। সৈনিকরা কেউ রক্ষা পেয়েছে বলে মনে হলো না। ওর চোখের সামনে ডুবে গেল গানবোট। লঞ্চেরও অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত, তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে সরে এল রানা, চোখে লাগল নতুন দিনের প্রথম রোদ।

চোদ্দ

পারে উঠে রানা দেখল একটা ঝোপ থেকে মুখ বের করে ওকে দেখছে নেহাল। সিধে হলো, ছুটে এসে রানার হাত ধরল। 'বাস্টব দুনিয়ায় আপনিই আমার ফার্স্ট হিরো। আমি কি আপনার কোন হেলপে আসতে পারি, স্যার?'

মিসেস হাসান বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনার কিছু হয়নি।'

চারদিকটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা। রুক্ষ পাহাড়ী

এলাকা হলেও, যত্ত দূর চোখ যায় বেশ কিছু ঝোপ আর খেজুর গাছ আছে। থলেটা চেক করল ও, কয়েকটা গ্রেনেড পড়ে গেছে পানিতে। ল্যুগারের ম্যাগাজিনে বুলেট আছে পাঁচটা। টমিগানের ক্লিপ তিন চতুর্থাংশ খরচ হয়ে গেছে। যথেষ্ট নয়, তবে এ দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

'এবার?' মিসেস হাসান জানতে চাইলেন।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে রানা বলল, 'খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়, পুবে একটা রেল লাইন পাওয়া যাবে। চলুন হাঁটি।'

প্রথম কিছু দূর বুনো গাছপালা আর ঝোপ পাওয়া গেল, আড়াল নিয়ে এগোতে সমস্যা হলো না। তারপর বাধ্য হয়েই রোদে বেরুতে হলো। মাইল তিনেক হাঁটার পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ল নেহাল। মিসেস হাসানও হাঁপাচ্ছেন। বিশ্রামের জন্যে থামতে হলো রানাকে। এরকম কয়েকবার।

তিনটে চূড়া টপকাল ওরা। তারপর, দুপুরের দিকে, রেললাইন দেখা গেল।

লাইনটা উঁচু জায়গায়, দু'পাশে নিচু খাদ। খাদের ঢালু গায়ে শুয়ে থাকল ওরা মা-ব্যাটা, চারদিকটা দেখে একটু পর ফিরে এল রানা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকালেন মিসেস হাসান।

'এদিকে কোন জনবসতি বা রাস্তা নেই,' বলল রানা। 'ট্রেন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'ট্রেন এলেই বা কি? সেটা আমাদের জন্যে থামবে কেন? থামলেও যে সাহায্য করবে, তার কি নিশ্চয়তা?'

হেসে ফেলল রানা। 'সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, মিসেস হাসান। ট্রেনে আমরা লুকিয়ে উঠব। তার আগে ওটাকে থামাতে হবে।'

'কিভাবে?'

'আমার সঙ্গে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি,' বলে খাদের কিনারা ধরে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা।

কাজটা এত কঠিন, যে-কোন বাঙালী মহিলা হলে শুনে আঁতকে উঠত, আর করতে বলা হলে সম্ভবত অপমানও বোধ করত। কিনারা ধরে কিছুটা হেঁটে খাদের ঢালু গা বেয়ে বিশ গজের মত নামল রানা। এদিকে প্রচুর ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে। কোমরে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা বের করে বলল, 'আমি এগুলো কাটি, আপনারা দু'জন নিয়ে গিয়ে লাইনের ওপর একটা স্তূপ তৈরি করুন।'

মিসেস হাসান জানতে চাইলেন, 'স্তূপ কতটা উঁচু হলে ট্রেন থামবে বলে আপনার ধারণা?'

'অন্তত ছয় ফুট,' বলল রানা। 'তবে থামতে না-ও পারে। স্পীড কমালেই খুশি আমি, লাফ দিয়ে উঠে পড়ব সবাই। মনে রাখবেন ড্রাইভার বা প্যাসেঞ্জার কেউ দেখে ফেললে চলবে না।'

'ঠিক আছে। নিন, শুরু করুন।'

কাজটা শেষ হতে দু'ঘণ্টা লেগে গেল। তিনজনই ওরা ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। স্তূপটা থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে খাদের ঢালে শুয়ে আছে ওরা, এমনকি কথা বলার শক্তিও যেন ফুরিয়ে গেছে।

রানা আর নেহাল পাশাপাশি শুয়েছে, মিসেস হাসান বেশ একটু তফাতে। এক সময় রানার কানে ফিসফিস করল নেহাল, 'ভাইয়া, মম্‌কে নিয়ে আমি চি-ন-তি-তো।'

'কেন?' চোখ মেলে তাকাল রানা।

'আপনি সোজাসুজি অ্যানসার করবেন, প্লীজ,' বলল নেহাল। 'দেশে ব্যাক কোরা বোডহয় আমাদের পকখে কুনোদিনও স-ম-ভ-ব হোবে না, তাই না কি?'

'একদম বাজে কথা,' বলল রানা। 'আমাদের হাতে রাত বারোটা পর্যন্ত সময় আছে। এখন বিকেল চারটে। সোজা পথ মাত্র ষাট মাইল পেরুতে হবে আমাদের। দুশ্চিন্তা যদি করতেই হয়, মাঝরাতের দশ মিনিট আগে থেকে শুরু করব। তার আগে

পর্যন্ত নিজেকে অটো সাজেশন দাও—পারব, পারব, পারব।'

হেসে ফেলল নেহাল। 'ভাইয়া, আপনি খুব…বুঝতে পারছি না কি বলব।'

হঠাৎ মিসেস হাসান চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ট্রেন!'

অস্পষ্ট হলেও হুইসেলের শব্দটা এরাও এবার শুনতে পেল। তিনজন একসঙ্গে ছুটল, ডালপালার স্তূপটা থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। ওদের পিছনে এক সময় সেটা আর দেখাই গেল না। লাইন থেকে সরে এসে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা।

এঞ্জিনের শব্দ কাছে চলে এসেছে। টমিগানটা যথেষ্ট ভারী, তবে সেটা বেশ অনায়াস ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে নেহাল। কান ঝালাপালা করা গর্জন তুলে পৌঁছে গেল ট্রেন, স্পীড এত বেশি যে প্রকাণ্ড কালো ডিজেল এঞ্জিনটাকে ঝাপসা দেখাল, চোখের পলকে বেরিয়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে, বগিগুলোও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। বিড় বিড় করছে রানা—থাম ভাই! একটু আস্তে যা!

লাইনের সঙ্গে চাকা ঘষা খেলো, তীক্ষ্ণ শব্দে রিরি করে উঠল গা। বগিগুলো এখন আর আগের মত ঝাপসা লাগল না। একটার দরজা খোলা দেখল রানা। ঘর্ষণের একটানা তীক্ষ্ণ শব্দ থামছে না, জোড়া লাগানো বিশাল সরীসৃপ গতি হারাচ্ছে। সংঘর্ষের ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, ডালপালার স্তূপে ধাক্কা খেয়েছে এঞ্জিন। ঘর্ষণের শব্দ বাড়ছে, গতি কমছে এখনও ট্রেনের, কিন্তু থামবে কিনা সন্দেহ। গতি এখনও অন্তত ঘণ্টায় দশ মাইল।

'ড্রাইভার থামছে না,' হঠাৎ বলল রানা। 'আসুন, পরে আর সময় পাব না।' ক্লান্ত পা দুটোয় শরীরের সমস্ত শক্তি যোগান দিয়ে ছুটল রানা একটা বক্সকার-এর খোলা দরজার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কার-এর মেঝেতে হাত রেখে লাফ দিল, শূন্যে থাকতে মোচড় খাওয়াল শরীরটাকে, দোরগোড়ায় নামল হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গিতে। ওর ঠিক পিছনেই ছিলেন মিসেস হাসান, কিন্তু তিনি পিছিয়ে পড়েছেন।

দরজার চৌকাঠ ধরে বাইরের দিকে ঝুঁকল রানা, হাত পেঁচাল কোমরে, তারপর হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল মিসেস হাসানকে, ওর মাথার ওপর দিয়ে বক্সকার-এর পিছন দিকে নামলেন তিনি। এরপর আবার ঝুঁকল রানা, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল নেহালকে।

তিনজনই হাঁপাচ্ছে ওরা। কারের ভেতর প্রচুর খড় আর গোবরের গন্ধ। রানা আন্দাজ করল ট্রেনের গতি এখন সম্ভবত ঘণ্টায় বারো মাইল হবে। ক্রমেই গতি বাড়ছে আবার। দেখতে দেখতে স্পীড উঠে গেল চল্লিশ মাইলে।

নদীপথ ধরে গেলে ভারতীয় কাশ্মীরের নাওয়ানশাহরে পৌঁছাতে আর ষাট কি সত্তর মাইল পেরুলেই চলত। কিন্তু রেললাইন ক্রমশ নদীর কাছ থেকে পুবে সরে যাওয়ায় ওদের গন্তব্য ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে। রানার জানে, এই ট্রেন ওয়াজিরাবাদ-শিয়ালকোট হয়ে ঘুরে চলে যাবে পাসুর হয়ে লাহোরের দিকে। শিয়ালকোটের কাছাকাছি কোথাও নেমে না পড়লে অসুবিধা হবে।

খড়ের ওপর শুয়ে মা ও ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। টমিগ্যান ও ল্যুগারের প্রতিটি শেল কাপড়ে ঘষে শুকালো রানা। কাজটা শেষ হতে খড়ের ওপর কাত হতে যাবে, অনুভব করল ট্রেনের স্পীড কমে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে এল ও। উঁকি দিতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সর্বনাশ! গোধূলির আবছা আলোয় দেখা গেল আকালগড় নামে ছোট্ট একটা স্টেশনে থামছে ট্রেন, এঞ্জিনের কাছাকাছি প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ-পঁচিশজন সৈন্য। আরও একটা বিস্ময়কর বাস্তবতা ধীরে ধীরে হজম করতে হলো ওকে। এঞ্জিন আর ওদের কার-এর মাঝখানে আরও দশটা কমপার্টমেন্ট রয়েছে, প্রায় প্রতিটির দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা সৈনিক, বোঝার চেষ্টা করছে কি কারণে থামছে ট্রেন। তারমানে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ওরা সৈন্য ভর্তি একটা

ট্রেনে আশ্রয় নিয়েছে!

তবে আসল দুশ্চিন্তা, ট্রেনটা সম্ভবত থামানো হচ্ছে সার্চ করার জন্যে। টেলিফোন বা রেডিওর সাহায্যে সীমান্ত ঘেঁষা প্রতিটি সেনা ক্যাম্পে খবর চলে এসেছে, পলাতক তিন শত্রুকে ধরো।

হিসহিস আর ক্যাঁ-চ শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল এঞ্জিন। প্রতিটি কমপার্টমেন্ট থেকে পিলপিল করে নেমে আসছে সশস্ত্র সৈনিকরা। সবার মনেই কৌতূহল, অনির্ধারিত এই বিরতির কারণ কি। তবে শৃংখলা ভঙ্গের কোন ঘটনা ঘটছে না, নিচে নেমে সবাই যে-যার কমপার্টমেন্টের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

রানার ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস ফেলল নেহাল। 'ভাইয়া! কি ঘটছে?'

ঘাড় ফেরাতে নেহালের পিছনে মিসেস হাসানকেও দেখতে পেল রানা। 'ওরা আমাদের খোঁজে এখন প্রতিটি কমপার্টমেন্ট সার্চ করবে,' দ্রুত বলল ও। 'ওদিকের দরজা দিয়ে বেরুব আমরা, ছাদে উঠে ট্রেনের পিছনে নামব। ওদের চোখ ফাঁকি দেয়ার এটাই একমাত্র উপায়। জলদি!'

বক্সকার-এর উল্টোদিকের দরজাও খোলা। উঁকি দিয়ে ট্রেনের দু'পাশে চোখ বোলাল রানা। এদিকটায় ট্রেন থেকে কেউ নামেনি।

নেহালকে ছাদে উঠতে সাহায্য করল রানা। নেহাল মিসেস হাসানের হাত ধরে টেনে তুলে নিল। হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেনের পিছন দিকে চলেছে ওরা, ওদের পিছু নিল রানা।

ট্রেন থেকে নেমে লাইনেই থাকল ওরা, তিনজনই ছুটছে। সন্ধ্যা ইতিমধ্যে আরও গাঢ় হয়েছে। ট্রেন থেকে দুশো গজের মত পিছনে আসার পর রানা লক্ষ করল, রেল লাইনের বাম দিকে এখন আর কোন খাদ নেই, সমতল মাটির বুকে ঝোপ আর গাছপালা বেশ ঘনই। ওদেরকে থামিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল ও, সন্ধ্যার কালিমা আরও একটু গাঢ় হতে দিল, তারপর লাইন

ছেড়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

কিছুদূর এগোনোর পর পায়ে হাঁটা একটা পথ পাওয়া গেল, পুবদিকে চলে গেছে।

রানার কাছে দেশলাই থাকলেও পথ চেনার জন্যে ওটা কোন কাজে আসবে না। ওদেরকে কথা বলতে নিষেধ করল ও। কোথায় যাচ্ছে জানে না, তবে মনে আশা যানবাহন চলাচল করে এমন একটা রাস্তা পেয়ে গেলে সীমান্তের দিকে যাবার একটা উপায় ঠিকই করে নিতে পারবে।

দু'ঘণ্টা পর রাস্তা নয়, আরও একটা ট্রেন লাইন দেখল ওরা। লাইনটা মোটামুটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। লাইনের ধারে থেমে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। আরেকটা ট্রেন থামিয়ে তাতে চড়ার প্ল্যানটা বাস্তবসম্মত নয়, জন্মলগ্নেই আইডিয়াটার অকালমৃত্যু ঘটল। দক্ষিণ আকাশের মেঘ খানিকটা আলোকিত দেখে রানা আন্দাজ করল, ওদিকে একটা শহর আছে, এবং সেটা গুজরানওয়ালা হবারই সম্ভাবনা বেশি। এদিকের ম্যাপ যতটুকু স্মরণ করতে পারল, পুবে আর কয়েকশো গজ গেলেই পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে—ওটা ধরে কয়েক মাইল উত্তরে গেলে ছোট্ট শহর ওয়াজিরাবাদ। সেখান থেকে উত্তরে গুজরাত আর পুবে শিয়ালকোট—যেদিকে খুশি যাওয়া যাবে। শিয়ালকোট থেকে ভারতীয় সীমান্তের দূরত্ব বড়জোর দশ কি বারো মাইল।

রানা বুঝতে পারছে, পালাতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। প্রথম কাজ সামনের রাস্তায় পৌঁছানো, তারপর একটা গাড়ি থামিয়ে বা যেভাবে হোক সীমান্তের দিকে যাওয়া।

রেললাইন টপকে আবার হাঁটা ধরল ওরা। সরু, পায়ে-হাঁটা পথটা লাইনের এদিকেও আছে, ফলে জঙ্গলে হারিয়ে যাবার ভয় নেই।

রাস্তাটা পাওয়া গেল রাত দশটায়।

লম্বা-চওড়া কাঠামো, স্বাস্থ্যও ভাল, তা সত্ত্বেও ক্লান্তির চরম

সীমায় পৌঁছে গেছেন মিসেস হাসান, যদিও এখন পর্যন্ত একটি বারও তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি।

নেহালের অবস্থা আরও খারাপ, রাস্তার ধারে শুয়ে পড়ল সে। একটু পর দেখা গেল ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন মিসেস হাসান, চোখ দুটো বন্ধ। রানা তাঁর পাশে, দু'হাত ব্যবধান রেখে বসেছে, রাস্তার ওপর দৃষ্টি।

রানা ভাবছে, গাড়ি দেখলেই সেটাকে থামাবার চেষ্টা করাটা হবে স্রেফ বোকামি। এই পরিস্থিতিতে গাড়ি মাত্রই সেনাবাহিনীর হবার সম্ভাবনা। কোনও সন্দেহ নেই, সেনা সদস্যদের সবাইকেই সতর্ক করা হয়েছে। ওকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'আমি জানি কি ভাবছেন আপনি,' হঠাৎ রানাকে চমকে দিয়ে বললেন মিসেস হাসান। 'গাড়ি এলে সেটাকে কিভাবে থামাবেন, তাই না?'

হেসে ফেলল রানা। 'হ্যাঁ। কি করে বুঝলেন?'

'এটাই এখন প্রধান সমস্যা, তার সমাধানই তো খুঁজবেন। তবে সমাধান আপনার কাছে নেই, আছে আমার কাছে।'

'কি রকম?'

'আপনাকে দেখলেই ওরা গুলি করতে পারে,' বলল মিসেস হাসান। 'কিন্তু আমাকে দেখলে করবে না। পাকিস্তানী সৈন্যরা কি জিনিস, কিছুটা ধারণা আমার হয়েছে। মেয়েছেলে দেখলেই ওদের স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পায়।'

'তো আপনার প্ল্যানটা কি?'

'আমি গ্রহণযোগ্য একটা আইডিয়া দিলাম,' বললেন মিসেস হাসান, ক্লান্ত মুখে ম্লান হাসি। 'আপনি একটা প্ল্যান দিন।'

পাঁচ মিনিট পর নেহালের ঘুম ভাঙানো হলো। তারপর প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল রানা। 'নেহাল রাস্তার এক পাশে লম্বা হয়ে

শুয়ে থাকবে। মিসেস হাসান, আপনার গল্পটা হবে, আপনাদের কার পাশের ডোবায় পড়ে গেছে। আপনার ছেলে আহত, জরুরী সাহায্য দরকার।'

তিনজনই ওরা রাস্তা থেকে নেমে পানি ভরা ডোবার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

প্রথম হেডলাইট দেখা গেল আধঘণ্টা পর। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে রানা বলল, 'ট্রাক। কাজেই বাদ।' কারণটা পরিষ্কার, ট্রাক ভর্তি সৈন্যকে একা ও সামলাতে পারবে না।

দশ মিনিট পর আরও একজোড়া হেডলাইট দেখা গেল। এটাও গুজরানওয়ালার দিক থেকে আসছে। জোড়া হেডলাইট রাস্তার কাছাকাছি, লক্ষ করে রানা বলল, 'এটা বোধহয় প্রাইভেট কার। যাও, নেহাল, শুয়ে পড়ো।'

ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠল নেহাল, লম্বা হয়ে শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিল। তার পিছু নিয়ে রাস্তায় উঠলেন মিসেস হাসানও। ধীরে ধীরে রাস্তার মাঝখানে সরে গেলেন তিনি। গাড়িটা কাছে চলে আসতে হাত তুলে থামার ইঙ্গিত দিলেন।

সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল কার, মিসেস হাসানের কাছ থেকে সাত ফুট দূরে।

ড্রাইভার সহ ওরা তিনজন। প্রথমে নিচে নামল আরোহী দু'জন, ইউনিফর্ম পরা দুই তরুণ ক্যাপটেন। কোন প্রয়োজন ছিল না, মিসেস হাসানকে ধরার জন্যে ছুটে এল তারা–পেয়েও যদি হারাতে হয়!

ঘুরে দৌড়াতে যাবেন মিসেস হাসান, পিছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা হিংস্র হায়েনার মত। মিসেস হাসান যতই নিজের বিপদের কথা বলতে চাইছেন, ততই হেসে উঠছে তারা, জড়িয়ে ধরে রাস্তার ধারে ঝোপের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রানার কাজ সহজ করে দিল ড্রাইভার। সে-ও গাড়ি থেকে নেমে অফিসারদের সাহায্য করতে রওনা হলো। রানার ছুরি তার

পিঠ দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ড চিরে দিল। লোকটার পতনের শব্দ শুনে ক্যাপটেনদের একজন ঘাড় ফেরাল, পরমুহূর্তে মিসেস হাসানকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটল সে, একটা হাত হোলস্টারে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ তার চোখ জোড়া কপালে উঠে গেল, যেন সদ্য তৈরি কপালের লাল ফুটোটা দেখতে চায়। সে নয়, ফুটোটা তার সঙ্গী দেখতে পেল। সে-ও ওই একই বোকামি করল, মিসেস হাসানকে ছেড়ে দিয়ে লাফ দিল, হাতে বেরিয়ে আসছে পিস্তল। রানা যেন টার্গেট প্র্যাকটিস করছে, আর কপালের মাঝখানটা ছাড়া আর কিছু ওর পছন্দ নয়।

পরবর্তী তিন মিনিট অত্যন্ত ব্যস্ত থাকল রানা। এক এক করে তুলে লাশগুলো ফেলে আসতে হলো ডোবার পানিতে। 'নেহাল, গাড়িতে ওঠো!' ডোবা থেকে উঠে এসে ছেলেটাকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমক দিল। কিন্তু তারপরও নেহাল নড়ছে না। এগিয়ে এসে তাকে জোরে একটা ঝাঁকি দিল ও। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে গাড়ির দিকে এগোল নেহাল। মিসেস হাসান আগেই ব্যাকসীটে উঠে বসেছেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি। গাড়িতে একটা শর্ট ওয়েভ রেডিও রয়েছে, অন করা। রানা এসে বন্ধ করল সেটা, কপালে চিন্তার রেখা। ড্রাইভার কি কোথাও কোন মেসেজ পাঠিয়েছে?

গাড়িটা পুরানো হলেও, মার্সিডিজ; ফুয়েল ট্যাংকও প্রায় ভরা। এমনিতে ফাঁকা রাস্তা, তার ওপর তাড়াতাড়ি সীমান্তে পৌঁছানোর ব্যাকুলতা, ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে গাড়ি ছোটাল রানা।

আধঘণ্টার মধ্যে ওয়াজিরাবাদ পৌঁছে ডানে শিয়ালকোটের দিকে মোড় নিল মার্সিডিজ। রানার হিসাবে সীমান্ত শিয়ালকোট থেকে বিশ মাইলও হবে না। শেষ বাধাটা ওখানেই পাবে ওরা—বর্ডার পোস্ট। কিন্তু পাঁচ মাইলও এগোয়নি, পিছনে একজোড়া হেডলাইট দেখা গেল। রাস্তা থেকে যথেষ্ট ওপরে

ওগুলো, রানা আন্দাজ করল ট্রাকই হবে।

হঠাৎ কাঁধে কারও স্পর্শ অনুভব করল রানা। তারপর নেহালের গলা ঢুকল কানে, 'আই য়্যাম সরি, ভাইয়া। আগে কখনও এভাবে মানুষ মরতে দেখিনি তো...'

'এতে দুঃখিত হবার কিচ্ছু নেই, নেহাল,' বলল রানা। 'তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে তার হয়তো আরও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হত। এ স্বাভাবিক।'

'তবু আপনার প্রতি আমি গ্রেটফুল, ভাইয়া। আফটার অল, শেষ পোরযোন্ত, আপনি আম্মার ড্যাডিকেই তো বাঁচাইতে চেষ্টা করতেছেন...'

হঠাৎ আকাশ থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। অনেক দূরে, তবে দ্রুত কাছে চলে আসছে।

'হেলিকপ্টার!' ব্যাকসীট থেকে বললেন মিসেস হাসান, আতঙ্কে গলা প্রায় বোঁজা। 'আমাদের মাথার উপর চলে এসেছে!'

কোন সময়ই পাওয়া গেল না, অকস্মাৎ অসংখ্য বজ্রপাতের মত ঝাঁক ঝাঁক বুলেট নেমে এসে মার্সিডিজের চারপাশের পাকা রাস্তা খাবলাতে শুরু করল। রানা হুইল ঘোরাল পাগলের মত। প্রথম ডান দিকে, তারপর বাম দিকে, এভাবে ঘন ঘন। প্রবল বাতাসের ঝাপটা লাগল হেলিকপ্টার গানশিপ মাথার ওপর দিয়ে যাবার সময়। বাঁ দিকে ঘুরছে ওরা। নাকের সামনে পাহাড় চূড়া থাকায় ওপরেও উঠছে, ঘোরা শেষ করে ফিরে আসবে আবার। মার্সিডিজের স্পীড এই মুহূর্তে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। ঘাড় ফেরাতে পাঁচ-ছয়শো গজ পিছনে সৈন্যভর্তি ট্রাকটা দেখতে পেল রানা। ওভারটেক করার কোন লক্ষণ নেই।

'এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পেল কিভাবে?' মিসেস হাসান পিছন থেকে জানতে চাইলেন।

'আমারই ভুল।' বলল রানা। 'আপনাকে দেখতে পেয়ে ক্যান্টনমেন্টে মেসেজ পাঠিয়েছিল মার্সিডিজের ড্রাইভার।

রেডিওটা খোলা দেখার পর এই গাড়ি আমাদের ব্যবহার করাই উচিত হয়নি।'

'আর কোন উপায়ও ছিল না।'

'তবে এখন তো বাঁচতে হবে!' এই মারাত্মক বিপদের মুখেও আত্মবিশ্বাস ও সাহস হারায়নি রানা, সেটা লক্ষ করে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন মিসেস হাসান।

যেন তাঁকে শুনিয়েই, কিংবা হয়তো জনান্তিকে, বলল রানা, 'একটা চেষ্টা করে দেখি। আমার ধারণা, পাইলট যা কিছু করছে সবই মার্সিডিজের হেডলাইটের ওপর চোখ রেখে।'

ঘোরাটা এখনও শেষ করেনি গানশিপের পাইলট। গাড়ির আলো নিভিয়ে দিল রানা, তারপর রাস্তার কিনারায় সরে এসে ব্রেক কষে দাঁড় করাল মার্সিডিজকে।

পিছন থেকে নেহালের দম ফেলার ভারী শব্দ ভেসে আসছে। আশপাশে কোন গাছ নেই যে তার তলায় আশ্রয় নেবে ওরা। রানার এই হিসাবটাও হয়তো ভুল, গাড়ি থামিয়ে গানশিপের গানারকে সহজ টার্গেট উপহার দিয়ে ফেলেছে। তারপর এঞ্জিনের আওয়াজটা আবার শুনতে পেল। ক্রমশ বাড়ছে। সারা শরীরে ঘামের [illegible]রা অনুভব করল রানা। সৈন্য ভর্তি ট্রাক স্পীড বাড়িয়ে পাশ কাটাল মার্সিডিজকে। এবার অনেক নিচ দিয়ে ছুটে আসছে গানশিপ। সরাসরি মাথার ওপর এসে থামল ওটা। ঝুলে থাকল এক কি দুই সেকেন্ড, তারপর খসে পড়ার ভঙ্গিতে আরও নিচে নামল। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে রানা। হঠাৎ দেখল গানশিপের দুই দরজায় ঝলসে উঠল আগুন, পরমুহূর্তে মর্টারের গর্জন শোনা গেল। ইতিমধ্যে দুই-তিনশো গজ এগিয়ে গিয়েছিল ট্রাকটা, অকস্মাৎ কমলা আগুনের প্রকাণ্ড একটা বল হয়ে গেল সেটা। দিক বদলে আবার ওপরে উঠছে গানশিপ আরেকটা চক্কর দেয়ার জন্যে।

'আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি,' বলল রানা।

মিসেস হাসান নিজেও বোধহয় জানেন না, রানার একটা কাঁধ খামচে ধরেছেন তিনি।

ওদের চোখের সামনে গোটা ট্রাক দাউদাউ করে জ্বলছে। মর্টার শেলের একাধিক আঘাত, পেট্রল ট্যাংকের বিস্ফোরণ, তার ওপর সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা একজন সৈন্যকেও বাঁচতে দেয়নি।

নিজেদের কৃতিত্ব দেখার জন্যে আবার ফিরে এল গানশিপের পাইলট, তবে এবার অনেক ওপরে থাকল। মার্সিডিজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা, অন্ধকারে ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওদের কারও কোন ধারণাই নেই।

তিন মিনিট পর স্টার্ট দিয়ে মার্সিডিজ ছেড়ে দিল রানা। রাস্তার কিনারা ধরে এগোল ওরা। জ্বলন্ত ট্রাককে পাশ কাটাবার সময় মিসেস হাসানকে রানা বলল, 'নেহালের চোখে হাতচাপা দিন।' রাস্তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে সৈনিকদের লাশ, বেশিরভাগ এখনও জ্বলছে, বাতাসে মাংস পোড়ার উৎকট দুর্গন্ধ। শুধু নেহালের নয়, দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে মিসেস হাসানও হাত চাপা দিলেন চোখে।

ট্রাক ও লাশগুলোকে পাশ কাটিয়ে এসে মার্সিডিজের স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। শিয়ালকোটকে এড়িয়ে কোনাকুনি একটা বাই-লেন ধরে আবার উঠে এসেছে সে বড় রাস্তায়। সামনে আর কোন শহর নেই, কাছে দূরে দু'একটা গ্রাম থাকলেও থাকতে পারে, তবে রানার দেখা ম্যাপে তার উল্লেখ নেই।

কোন সন্দেহই নেই, সীমান্ত এলাকার প্রতিটি পাকিস্তানী সৈন্য এখন খুঁজছে ওদের। সীমান্ত রেখা পার হতে হলে সামনের সমস্ত বাধা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগোতে হবে ওদেরকে। রানার যতটুকু জানা আছে, রাস্তার শেষ মাথায় বর্ডার পোস্ট বলতে বোঝায় কাঁটাতারের বেড়া, আর বেড়ার মাঝখানে একটা গেট। তবে একটা ব্যারিয়ার তো অবশ্যই থাকবে।

তারপর রানার মনে পড়ল। শুধু সীমান্তের এপারে কেন, ওঃ একই ধরনের একটা বেড়া, বেড়ার গায়ে গেট আর গেটের ভেতর একটা ব্যারিয়ার তো ভারতীয় কাশ্মীরের দিকেও থাকবে। তারমানে এক প্রস্থ নয়, মার্সিডিজকে দুই প্রস্থ বাধা গুঁড়িয়ে এগোতে হবে।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে, সেটাও একটা কঠিন প্রশ্ন। ঢাকায় রানা মেসেজ পাঠিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা পাবার পর বিসিআই হেডকোয়ার্টার ভারতে কাউকে পাঠিয়েছে কিনা, সে বা তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিনা, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ-কে ওদের সম্ভাব্য আগমন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরই উত্তর রানার জানা নেই।

রাস্তাটা সরল, বর্ডার পোস্ট অনেক দূর থেকে দেখতে পাবার কথা। দিনের বেলা এই রাস্তায় যানবাহনের ভিড় লেগে থাকে—ভারতীয় কাশ্মীর থেকে আসে শিখ তীর্থ যাত্রীরা, হিন্দু ও মুসলমানরা আসে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে, আর আসে ব্যবসায়ীরা; এদিক থেকেও প্রচুর লোকজন যায় ওদিকে।

'বারোটা কিন্তু বেজে গেছে, ভাইয়া!' পিছন থেকে হঠাৎ মনে করিয়ে দিল নেহাল।

'হ্যাঁ, জানি,' হেসে উঠে বলল রানা। 'তবে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আর মাত্র একটা বাধা পেরুতে পারলেই...'

থেমে গেল রানা, সামনে আলো দেখা যাচ্ছে। গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনল ও। দূরে, রাস্তার ওপর, একটা গার্ড রেইল দেখা যাচ্ছে। এক পাশে সরে এসে মার্সিডিজ দাঁড় করাল ও। গেটের কাছাকাছি দশ-বারোজন সৈনিক ঘোরাফেরা করছে, প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেল। গার্ড রুমের সামনে ফিট করা হয়েছে একটা মেশিন গান। রাস্তাটা নির্জন ও অন্ধকার, তবে গেটের কাছে প্রচুর আলো।

'ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতার কোন সম্ভাবনা নেই,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আমি একা, ওরা অসংখ্য না হলেও সব মিলিয়ে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশজন। কাস্টমস শেডে যারা আছে তাদেরকে ধরছি না। যুদ্ধ করার মত ফায়ারপাওয়ারও নেই আমাদের...'

'তিনটা রাইফেল আছে ইদিকে,' পিছন থেকে বলল নেহাল।

ঘাড় ফেরাল রানা। 'গুড। কাজে লাগবে ওগুলো।' মিসেস হাসানের দিকে তাকাল ও। গার্ড রেইলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'হতাশ হবেন না।' তাঁকে বলল ও। 'মনে সাহস রাখুন।'

মিসেস হাসান নিঃশব্দে কেঁদে ফেললেন। 'আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করে এত দূর নিয়ে এসেছেন আমাদের। এখন যদি এই শেষ বাধাটা পার করে আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হন, আমি তা মেনে নেব না।'

তাঁর কথা শুনে হকচকিয়ে গেল রানা।

'হাসানকে কখনও দেখতে পাব, এ আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। আপনিই আমাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। একা শুধু আমাকে নয়, নেহালও ওর বাবাকে ফিরে পাবার জন্যে আপনার ওপর ভরসা করে আছে।'

কথাগুলো নাড়া দিল রানাকে। ভদ্রমহিলা এক ধরনের দাবি তুলছেন, যে দাবি শুধু বিশ্বাসযোগ্য আর স্নেহের কোন পাত্রের কাছেই তোলা যায়। এ এক ধরনের বিরল সম্মানও বটে। 'কে বলেছে আমি ব্যর্থ হব?' জোর করে একটু হাসল ও। 'দেখুন না কত সহজে ওপারে চলে যাই। আপনি ড্রাইভ করতে জানেন তো?'

মিসেস হাসান মাথা ঝাঁকালেন।

সীটের মাথা টপকে পিছনে চলে এল রানা। রাইফেলগুলো চেক করে দেখল, তিনটেই চাইনিজ অটোমেটিক। 'বাম জানালার কাঁচ নামাও,' নেহালকে বলল ও। ইতিমধ্যে সীট টপকে হুইলের

দায়িত্ব নিয়েছেন মিসেস হাসান। 'নেহাল, আমি চাই দরজার দিকে পিঠ দিয়ে মেঝেতে বসে থাকবে তুমি।' রানার নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করল ছেলেটা। শার্ট দিয়ে তৈরি থলেটা কোমর থেকে খুলল ও, নেহালের দুই পায়ের মাঝখানে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল চারটে গ্রেনেড। 'কি করতে হবে মন দিয়ে শোনো। আমি বললে দাঁত দিয়ে প্রথম গ্রেনেডের পিন খুলবে। পাঁচ পর্যন্ত গুনবে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়বে। দশ পর্যন্ত গুনবে। প্রথম গ্রেনেড ছোঁড়ার পর কি করবে? দশ পর্যন্ত গুনবে। গুনে দ্বিতীয় গ্রেনেডের পিন খুলবে...'

সব আবার নেহালকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করাল রানা। তারপর মিসেস হাসানের কাঁধের ওপর ঝুঁকে বলল, 'দেখতেই পাচ্ছেন, গেটটা নাক বরাবর সোজা। গাড়িটা আপনি স্বাভাবিক স্পীডে চালাবেন, এই ধরুন ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইলে। কিন্তু আমি বললেই স্পীড বাড়াবেন যত খুশি, কোনমতেই আশির কম নয়। তবে মাথা তুলতে পারবেন না। দু'জনকেই বলছি, কোন অবস্থাতেই মাথা উঁচু করা যাবে না।'

মিসেস হাসান মাথা ঝাঁকালেন।

রানা পজিশন নিল নেহালের উল্টোদিকের জানালা ঘেঁষে, হাতে টমিগান। রাইফেলগুলো নাগালের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে, হাত বাড়ালেই তুলে নিতে পারবে। 'সবাই তৈরি?' জিজ্ঞেস করল ও।

মা ও ছেলে মাথা ঝাঁকাল।

'নিন, স্টার্ট দিন!'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন মিসেস হাসান।

বিশ সেকেন্ড পর নির্দেশ দিল রানা। 'স্পীড বাড়ান!'

ঝাঁকি খেয়ে আরও জোরে ছুটল মার্সিডিজ।

গেটে দাঁড়ানো সৈনিকরা শুধু হেডলাইট দেখতে পাচ্ছে। কাঁধ থেকে এখনও রাইফেল নামাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে কৌতূহল

নিয়ে। তবে মার্সিডিজের স্পীড বাড়ছে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল তারা। রাইফেলগুলো প্রায় একযোগে নেমে এল কাঁধ থেকে। দু'জন লোক ছুটল মেশিনগান লক্ষ্য করে।

প্রথম বুলেটটা মার্সিডিজের উইন্ডশীল্ডকে মাকড়সার জাল বানিয়ে দিল। জানালার বাইরে কাঁধ বের করে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল রানা, মেশিনগানারদের একজন চিৎকার করে বলল, 'মার ডালা!' কনুই থেকে তার ডান হাত কাটা পড়েছে। টমিগানের আরেক পশলা গুলি ধাক্কা দিয়ে মেশিনগানের ওপর ফেলে দিল তাকে।

এক সঙ্গে অনেক রাইফেল গর্জে উঠল। মাকড়সার জাল ভেঙে যাচ্ছে। জানালার দিকে ঝুঁকে আরও দু'পশলা গুলি করল রানা, দেখল লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আবার ট্রিগারে টান দিয়ে দেখলো অ্যামিউনিশন শেষ। 'এখনই, নেহাল, এখনই!'

কয়েক সেকেন্ড হাতড়াল নেহাল, একটা গ্রেনেড ধরেও ফেলে দিল, আবার তুলল সেটা, দাঁত দিয়ে পিন খুলে জোরে জোরে গুনছে, 'এক...দুই...'

ক্রস-বার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ওরা, এই সময় প্রথম গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো, তবে তাতে মারা গেল মাত্র একজন গার্ড। মেশিনগান জ্যান্ত হলো, এক লাইনে সাত জায়গায় ফুটো হলো মার্সিডিজের গা। সামনের একটা জানালা ভেঙে অর্ধেক হলো, তারপর খসে পড়ল রাস্তার ওপর। রানার হাতে ল্যুগার চলে এসেছে। দ্বিতীয় গ্রেনেড ফাটল মেশিনগানের কাছাকাছি, তবে এত কাছে নয় যে গানাররা আহত হবে। ওটা আগের মতই সগর্জনে বুলেট উগরে দিচ্ছে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে মার্সিডিজের জানালা দরজা। উইন্ডশীল্ড বলে কিছু থাকল না। ছাদের কিনারা উড়ে গেল। অনবরত গুলি করছে রানা, কোনটা লাগাতে পারছে, কোনটা পারছে না। তারপর ট্রিগার টানতে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো শুধু। তৃতীয় গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো

গার্ডরূমের গায়ে। মাটির সঙ্গে মিশে গেল সেটা। মেশিনগানের একজন অপারেটরকে কি যেন একটা আঘাত করেছে, পড়ে গেল সে। মেশিনগানের গুলি মার্সিডেজের একটা টায়ার ফাটিয়ে দিল। অকস্মাৎ বাম দিকে ছুটল গাড়ি। 'হুইল ঘোরান! ডান দিকে!' চিৎকার করে বলল রানা। বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে গাড়ি সিধে করলেন মিসেস হাসান। এক সেকেন্ড পরই গার্ড রেইল গুঁড়িয়ে দিল ওরা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো সবাই। তবে মার্সিডিজ ফুল স্পীড বজায় রাখল। চতুর্থ গ্রেনেড কাঁটাতারের বিরাট একটা অংশ বাতাসে উড়িয়ে দিল। চীনা রাইফেল থেকে গুলি করছে রানা। লক্ষ্যভেদে এটা এত নির্ভুল, ওর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।

সামনে ভারতীয় কাশ্মীর, সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য ও পরিবেশ। ওদের গেট হাঁ-হাঁ করছে, ব্যারিয়ার তোলা, বিএসএফ বাহিনীর সদস্যরা বালির বস্তার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে মার্সিডিজের আগমন চাক্ষুষ করছে, প্রতিটি রাইফেল ওটার দিকেই তাক করা।

পাকিস্তানী সৈনিকরা মার্সিডিজের পিছনে বেরিয়ে এসেছে, কাঁধে রাইফেল তুলে গুলি করছে একযোগে। মার্সিডিজের পিছনটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, জানালার কাঁচ বলতে কিছু থাকল না।

দ্বিতীয় গেট পার হচ্ছে মার্সিডিজ। পাকিস্তানীদের রাইফেল এখনও গর্জন করছে, তবে একটা বুলেটও গাড়িতে লাগছে না।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল। এখন পর্যন্ত একটা গুলিও তারা ছোঁড়েনি। ব্যারিয়ারের নিচ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল মার্সিডিজ, কেউ বাধা দিচ্ছে না। সামনে কালো অজগরের মত পড়ে আছে পিচঢালা রাস্তা। একচোখো দৈত্যের মত ছুটে চলেছে মার্সিডিজ, মিসেস হাসান থামছেন না। কখন গুলি লেগে একটা হেডলাইট নিভে গেছে।

পরবর্তী তিন মিনিট কারও মুখে কথা নেই, ওরা যেন বোবা হয়ে গেছে।

'আমরা কি...' আবেগে বুজে এল গলা, মিসেস হাসান প্রশ্নটা

শেষ করতে পারলেন না।

'হ্যাঁ, বিপদ কেটে গেছে,' পিছন থেকে বলল রানা, হাতের চীনা রাইফেল জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। 'কিন্তু আমি নই, আপনিই আমাদেরকে পার করে এনেছেন।'

'লজ্জা দেবেন না, প্লীজ,' বললেন মিসেস হাসান। 'তাহলে কথাটা বলেই ফেলি—স্পীড বাড়াবার পর সেই যে আমি চোখ বন্ধ করে ছিলাম, এই একটু আগে খুললাম!'

'মম্!' নেহালের গলায় আদর মাখানো শাসনের সুর। 'তুমি আমার সঙ্গে যে খেলাটা খেলো, ভাইয়ার সঙ্গেও...'

মিসেস হাসান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মার্সিডিজ ব্যাকফায়ার শুরু করল, তারপর একনাগাড়ে খকখক শুকনো কাশি। একটু পরই বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন, ধীরে ধীরে গতি কমছে। মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে পড়ার পর ভাঙা কাঁচে পা দিয়ে নিচে নামল রানা, সামনের দরজা খুলে মিসেস হাসানের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'হাঁটতে হবে ঠিকই, তবে খুব বেশি নয়। জম্মু শহর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

দেখা গেল নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি। গাড়ি থেকে নামার সময় রানার হাতটা ধরলেন।

পাঁচ কি সাতশো গজ এগিয়েছে ওরা, এই সময় ওদের বাম দিক থেকে কর্কশ একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল। ক্রমশ বাড়ছে সেটা। চিনতে পারল রানা, হেলিকপ্টার এঞ্জিন। মুখ তুলে তাকাল ওরা, একটু পরই দেখা গেল কালো রঙ করা একটা হেলিকপ্টার গানশিপ, সার্চলাইট জ্বেলে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'পাশের ঝোপে!' চিৎকার করল রানা, নেহালের হাত ধরে ছুটল।

ঝোপের ভেতর ঢুকে বসে পড়লেন মিসেস হাসান। নেহাল তাকে জড়িয়ে ধরল।

হেলিকপ্টার গানশিপ ঝোপটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। একটু

পর সগর্জনে চলে গেল ওটা, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই।

'ওরা কি আমাদের দেখতে পেয়েছে?' জানতে চাইলেন মিসেস হাসান।

'সম্ভবত।' দাঁতে দাঁত চেপে আছে রানা।

'কিন্তু আমরা তো এখন কাশ্মীরে, কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে! এখানে পাকিস্তানী গানশিপ ঢুকল কোন সাহসে?'

'ওটা পাকিস্তানী হেলিকপ্টার নয়,' বলল রানা। 'ভারতীয়। পাকিস্তানীদের আমরা হারিয়ে দিয়েছি। এবার একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ভারতীয়দেরও হারাতে হবে।'

'মানে? কি বলছেন আপনি?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, মিসেস হাসান। সংক্ষেপে বলতে গেলে: প্রফেসর হাসানকে ভারতীয়রাও চায়। ওরা অবশ্য পাকিস্তানীদের মত জোর খাটাবে বলে আমি মনে করি না। তবে কূট চাল চালবে, নানারকম প্যাঁচ কষবে। এ-সব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, যা করার আমিই করব। তবে আপনাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন, কেন কি ঘটেছে তার কিছুই আপনি জানেন না।'

'ভাইয়া, ডেশের সারুথে ডরকার হলে ভারতীয়দের সঙ্গেও লড়ব আমরা,' হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলল নেহাল। 'কোন অবস্থাতেই ড্যাডিকে একানে আমরা রেকে যাব না।'

হেসে ফেলল রানা। 'এ বাচ্চার দেশপ্রেম দেখছি বড়দের চেয়েও বেশি!'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে আবার ওরা রাস্তায় নামল। এবার এক মাইলও এগোতে পারেনি, সামনের রাস্তায় তিন জোড়া হেডলাইট দেখা গেল।

রানার কাছে আর কোন গ্রেনেড নেই। ল্যুগারটাও খালি। অস্ত্র বলতে শুধু ছুরিটা। ভারতীয় কাশ্মীরে ভারতীয়দের তরফ থেকে কোন মারাত্মক বিপদ হবার কথা নয়, কিন্তু জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী

আর আইএসআই এজেন্টরাও তো ঘাপটি মেরে আছে এদিকে, তারা মরিয়া হয়ে কিছু করতে চাইলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তিন জোড়া হেডলাইট রোড সারফেসের এত কাছাকাছি, ওগুলো প্রাইভেট কার বলে মনে হলো। মিসেস হাসান ও নেহালকে আড়াল করে সামনে দাঁড়াল রানা। গাড়ি তিনটে এগিয়ে আসছে, স্পীড এখন খুব কম।

দুটো সাদা টয়োটা, একটা মাইক্রোবাস। রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে সামনের গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে আছে সোহেল আহমেদ, বিসিআই-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ওর পাশেই বসেছেন রানার গুরু বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

তিনটে গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে প্রথম গাড়ি থেকে ওঁরা কেউ নামলেন না। মাইক্রোবাস থেকে হুড়মুড় করে নেমে এল আট দশজন রিপোর্টার, প্রত্যেকের হাতে ক্যামেরা। তারপর দেখা গেল পিছনের টয়োটার প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে যাচ্ছে, এবং নিচে নামছেন উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, প্রখ্যাত বাংলাদেশী বিজ্ঞানী প্রফেসর মইনুল হাসান, ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাত স্লিঙের সঙ্গে বুকের কাছে ঝুলছে।

'ড্যাড!' চেঁচিয়ে উঠে সেদিকে ছুটল নেহাল।

'হাসান!' ফিসফিস করলেন মিসেস হাসান। 'হাসান!' তারপর তিনিও ছুটলেন সেদিকে।

সাংবাদিকদের ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করছে, ফ্ল্যাশ-এর আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন ওঁরা, তিনজনই কাঁদছেন। রানার পেশিতে একটু ঢিল পড়ল। এতক্ষণে সামনের গাড়ি থেকে নামলেন রাহাত খান, তাঁর দু'সারি দাঁতের ফাঁকে কালো একটা চুরুট। ধীর, কিন্তু দৃঢ় পায়ে তাঁর দিকে এগোল রানা।

'কংগ্রাচুলেশন্স, মাই বয়,' বললেন রাহাত খান। 'তোমার

মেসেজ পাবার পর আমরা হিসেব কষে বের করি, ফেরার জন্যে এই পথটাই বেছে নিতে হবে তোমাকে। তবে ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও একটা ধন্যবাদ দিতে হয়।'

সম্মান দেখিয়ে চুপ করে আছে রানা, জানে আরও কিছু বলবেন বস্।

'কারণ,' আবার বললেন রাহাত খান, 'ওদের একটা রিকনিস্যান্স প্লেন তোমার গতিবিধি মনিটর করছিল সেই একেবারে স্বর্গ থেকে।'

রাহাত খানের পাশে এসে দাঁড়াল সোহেল আহমেদ। 'পাকিস্তানীদের নতুন ক্যান্টনমেন্টে আগুন জ্বলছে, তারপর চেনাব নদীতে দুটো বোট বিস্ফোরিত হয়েছে, এ-সব রিপোর্ট পেয়ে আমরা ধরে নিই তুই আসছিস। আর এ তো জানা কথা যে তুই খালি হাতে ফেরার বান্দা...'

এই সময় বাধা। দ্বিতীয় গাড়িটা যেন হাস্যোজ্জ্বল মুখ-এর ভাণ্ডার, প্রফেসর মইনুল হাসানের পর সেটা থেকে এবার বেরিয়ে আসছেন আইসিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী গোপালা, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রামকিঙ্কর আচারিয়া ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল, মাধব সিন্ধিয়া। তাঁরা যে শুধু হাসছেন, তাই নয়, গোপন কি একটা সাফল্যে এতই উল্লসিত যে প্রকাশ্যে পরস্পরের পিঠও চাপড়ে দিচ্ছেন। ওঁদের মুখপাত্র হিসেবে অতিরিক্ত সচিব রামকিঙ্কর আচারিয়া রানার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'আপনি প্রকৃত পক্ষে ড. বাদল চৌধুরী নন, এটা জেনে আমরা প্রথমে হতাশ হই। কিন্তু আপনি আমাদের যে পরম উপকারটি করলেন, মিস্টার মাসুদ রানা, সেজন্যে ভারত সরকার আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।'

রানা আকাশ থেকে পড়ল। 'আমি কি সত্যি আপনাদের কোন উপকার করেছি?'

'ও, ইয়েস, অফকোর্স!' বললেন আচারিয়া মহাশয়। 'আপনার

চীফ্ জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে আগেই আমাদের কথা হয়ে গেছে। তার আগে বলে নিই, উনি হিন্টস দেয়ার পরই লেডি সুরাইয়া'স ইনে ঢোকার গোপন একটা পথ খুঁজে পাই আমরা, এবং আজ সন্ধ্যার পর ওই পথে ওঁৎ পেতে থাকি। গব্বর আর যশোবন্ত নামে আইএসআই-এর দুজন স্লীপার এজেন্ট প্রফেসর হাসানকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে, শূট আউটে গব্বর সিং মারা যায়...'

রানা ধৈর্য হারালেও সবিনয়ে জানতে চাইল, 'আপনার সঙ্গে বসের কি কথা হয়েছে?'

'কথা হয়েছে, প্রফেসর হাসান যদি স্বেচ্ছায় ভারতে বসবাস করতে চান, প্রতিবেশী দেশের একজন সম্মানীয় মেহমান হিসেবে অবশ্যই তাঁকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব, তাতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না...'

'স্যার!' হতভম্ব রানার গলা দিয়ে আওয়াজে বেরুতে চাইছে না।

'হ্যাঁ, রানা,' সোহেল বলল, 'মি. আচারিয়া ঠিকই বলছেন। প্রফেসর হাসান যা বলবেন, তাই হবে।'

রাহাত খান রানার বিস্ময়ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না, কারণ ভারতীয় কর্মকর্তারা তাঁকে প্রায় ছেঁকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসর হাসান ও তাঁর পরিবারের দিকে।

সোহেল আরও কিছু বলছিল, তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে রাহাত খানের পিছু নিল রানা। কোত্থেকে যেন ওর পাশে চলে এলেন কৃষ্ণস্বামী গোপালা। 'সত্যি, মিস্টার রানা, আমরা আপনার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না। যদি বলেন, কেন? উত্তর হলো, প্রফেসর হাসান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, স্ত্রী ও পুত্রকে ফিরে না পেলে তিনি বিজ্ঞান চর্চা ছেড়ে দেবেন। আমরা তখন তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, মিস্টার রানা ঠিকই ওদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। আমরা তাঁকে এ-ও বললাম, দরকার হলে মিস্টার

রানাকেও আমরা ভারতে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করব...'

ওদের সামনে তখন আরেক দৃশ্য। রাহাত খান ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের দেখে প্রফেসর হাসান স্ত্রী ও পুত্রকে ছেড়ে নিজেই এগিয়ে এলেন।

রামকিঙ্কর আচারিয়া তাঁকে বললেন, 'জেনারেল রাহাত খানকে আমরা এখন বিদায় জানাব, প্রফেসর হাসান। বর্ডার পোস্টের কাছে জেলে পাড়ায় দুটো হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, তার একটা ওঁদেরকে দিল্লিতে পৌঁছে দেবে, সেখান থেকে প্লেন ধরে ওঁরা দেশে ফিরে যাবেন। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন আলাপ করতে চান, পরে আর সময় পাবেন না।'

'জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে কথা যা বলার,' বললেন প্রফেসর, 'তা আমি দেশে ফেরার পথে বলব, মি. আচারিয়া।'

'দেশে ফেরার পথে...আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রফেসর!' রামকিঙ্কর হতভম্ব। 'আপনার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে...'

'কি কথা হয়েছে আমি ভুলিনি, মি. আচারিয়া।' প্রফেসর হাসলেন। 'আপনারা বলেছেন–এখন যে দেশগুলোকে আমরা হিন্দুস্থান, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ বলছি তা আসলে অখণ্ড ভারতেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে ভারত অখণ্ড ছিল, এবং আছেও। তাই আমি যদি ঢাকায় বাস করি, সেটাও অখণ্ড ভারতেই বাস করা হবে, আবার দিল্লিতে বাস করলেও তাই হবে। তো আমি এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ঢাকাতেই বাস করব। একই তো কথা–আপনারা ধরে নেবেন আমি অখণ্ড ভারতে বসেই গবেষণার কাজ করছি।'

'কিন্তু, জেনারেল রাহাত খান বললেন...'

'আমি বলেছি,' রাহাত খান সরু করে ধোঁয়া ছাড়লেন, 'প্রফেসর হাসান যা চাইবেন তাই হবে।'

'হ্যাঁ, তাই বলেছেন। আর সবাই আমরা জানি প্রফেসর হাসান ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন, তাই না?'

'আপনারা আসলে গোটা ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন,' হেসে উঠে বললেন প্রফেসর হাসান। 'আমি কখনোই ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইনি। ওটা পাকিস্তানীদের একটা চাল ছিল, বলতে পারেন অপকৌশল। ওরাই রটিয়ে দেয় যে আমি ভারতে আশ্রয় চেয়েছি। সেটা শুনে আপনারাও একেবারে...'

প্রফেসর জুতসই শব্দ খুঁজছেন, এই সময় ফটো-সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরল রানাকে। 'মিস্টার রানা, আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন...'

হাত তুলে তাদেরকে থামিয়ে দিল রানা। 'কথা বলতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু দুঃখিত, আমার সে অনুমতি নেই।' হাত তুলে মুখটা আড়াল করে রেখেছে রানা, ফটো তুলতে দিতে রাজি নয়। তবে সাংবাদিকদের মাধ্যমে এখানে গোটা দুনিয়া উপস্থিত থাকায় নিরাপদ ও স্বস্তিবোধ করছে ও। ইচ্ছা থাকলেও ভারতীয়রা ওদের কারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে বসকে বলল, 'স্যার, প্রফেসরকে নিয়ে আমরা রওনা হলেই তো পারি এবার?'

রাহাত খান সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রফেসর, গাড়িতে উঠুন, প্লীজ। রানা, মিসেস হাসান আর নেহালকে নিয়ে সোহেল একটা গাড়িতে উঠুক, তুমি আমার গাড়িতে থাকো।'

'কিন্তু, স্যার, ওঁরা কিভাবে যাবেন?'

'জেলে পাড়ায় পৌঁছেই গাড়ি ছেড়ে দেব আমরা। ওঁরা এখানেই একটু অপেক্ষা করুন।' রাহাত খান একে একে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দিকে তাকালেন। 'কি ভাই সাহেব, সম্মানীয় মেহমানদের জন্যে এইটুকু কষ্ট করবেন না?'

'ইয়ে, মানে, আপনারা যেটা ভাল মনে করবেন–হ্যাঁ, ঠিক আছে,' অবশেষে দ্বিধা ঝেড়ে সম্মতি জানালেন রামকিঙ্কর আচারিয়া।

‘তবে, জেনারেল খান, আমার একটা শেষ অনুরোধ,’ সামনে এসে দাঁড়ালেন ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর। ‘ভারত সরকার আপনাদেরকে যথাসাধ্য উষ্ণ আতিথেয়তা দেখিয়েছে, সে-কথা মনে রেখে আমরা আশা করব আপনাদের ইউরেকা প্রজেক্টের সমস্ত গবেষণা ও অর্জন আপনারা আমাদেরকে মনিটর করতে দেবেন...’

‘অত্যন্ত ভাল প্রস্তাব,’ গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। ‘ঢাকায় ফিরেই পররাষ্ট্র দফতরকে এ ব্যাপারে আমি ব্যবস্থা নিতে বলব।’ এরপর তিনি গলা একেবারে খাদে নামিয়ে রানাকে বললেন, ‘আমার ভয় হচ্ছে, ওরা কেঁদে ফেলতে পারে। পাগল হবার প্রথম লক্ষণ প্রলাপ বকা, দ্বিতীয় লক্ষণ কেঁদে ফেলা। তার আগেই আমাদের সরে পড়া উচিত।’

‘জ্বী, স্যার,’ বলল রানা। ‘তবে আমি দ্বিতীয় লক্ষণটাকে ভয় পাচ্ছি না। ভয় পাচ্ছি তৃতীয় লক্ষণটাকে।’

পাশ থেকে সোহেল জানতে চাইল। ‘তৃতীয় লক্ষণটা আবার কি?’

‘ওরা কামড়ে দিতে পারে,’ হাসি চেপে বলল রানা।

***